জগমগি
বুদ্ধদেব গুহ

পাবলিক
খুলনা

কালীপুজো অবধি হরিনাথপুরের ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে তেমন কাজকর্ম হয়না। কাজ শুরু হবে ভাইফোঁটার পরে পুরোদমে।

বড় হাকিমের ঘরে নগেন সাহার কেস-এর শুনানি চলছে। সদর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে তার গদি। মস্ত ব্যবসা। প্রায় চল্লিশ রকম মালের বিরাট মহাজনী কারবার। তার ওপরে বন্ধকী ব্যবসাও আছে। প্রফিট অ্যাণ্ড লস অ্যাকাউন্ট আর ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চল্লিশটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বানাতে হয় আলাদা করে প্রতিবছরই। প্রত্যেকটির গ্রস-মুনাফা আলাদা আলাদা করে টাইপ করে দিতে হয়। তার শতকরা হারও। পাশে পাশে, আগের বছরের সব ফিগার। কোনও অ্যাকাউন্টে যদি গ্রস মুনাফা কমে যায় তাহলে আলাদা করে তার জন্য আবার এক্সপ্ল্যানেশনও লিখে দিতে হয়।

কয়েকবছর আগে খোল, ভূষি, সর্ষে আর রেড়ির তেলের অ্যাকাউন্টে, হাকিম রহমান সাহেব, কয়েক লক্ষ টাকা যোগ করে দিয়েছিলেন। নসু মোক্তার আপিল করেছিলেন। কিন্তু অ্যাপেলেট অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার আপিল হারিয়ে দেন। কলকাতার এক নামী চার্টার্ড অ্যাকাউট্যান্টকে দিয়ে ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে আপিল করিয়ে নসু মোক্তার সমস্ত যোগই ছাড়িয়ে আনেন।

সেই ট্রাইব্যুনালের রায়টা বারে বারে পড়ে পূর্ণ রায়, ওরফে, প্যানা ; নসু মোক্তারের মুহুরি। কী চমৎকার ইংরিজি। কী চমৎকার সওয়াল। আর তেমনই অর্ডার। জে. দাস সাহেবের অর্ডার। এসব জানত না আগে প্যানা, রাধানগরে সাপুইদের কাছে যখন কাজ করত। এটা ঠিক যে, এসব সে নসু মোক্তারের কাছেই শিখেছে।

যে মেম্বারের নাম অর্ডারের নিচে, ডান দিকে থাকে, তিনিই অর্ডার ডিকটেট করেন, মানে, লিখেছেন বলে জানা যায়। বাঁপাশে অবশ্য অন্য মেম্বার সই করেন।

নগেন সাহা, ব্যবসায়ী হলেও নিজেও দুঁদে মুহুরি। অনেক মুহুরিকে কানে ধরে কাজ শিখিয়ে দিতে পারেন। প্রতিবছর ক্লোজিং স্টক আণ্ডারভ্যালু করে প্রফিট কমান। যদি কোনও বছরে সত্যি সত্যি লসও হয়ে যায়, তবুও খাতাতে প্রফিট দেখান, ট্যাক্স-দেওয়া এক নম্বরের টাকা যাতে লস হয়ে ভেসে না যায়, সেজন্য।

সেই যে কবে ট্রাইবুনাল বলে দিয়েছেন, কোন অ্যাকাউণ্টে কত গ্রস-প্রফিট বা জি. পি-র হার ন্যায্য বলে মান্য হবে, সেই অর্ডারকেই বেদবাক্য ধরে খাতা লেখেন। ট্রাইবুনাল যা বলে দিয়েছেন তাকেই মানেন নগেন সাহা। এবং হাকিমেরাও। অতএব খাতার মনে খাতা চলে, ব্যবসার মনে ব্যবসা। দু'নম্বরের মনে দু'নম্বর, এক নম্বরের মনে, এক'নম্বর।

অধিকাংশ ব্যবসায়ীদেরই মনোভাব এবং হাকিমদের মনোভাবও এমনই যে খাতা রাখা ও খাতা পরীক্ষা করাও অনেক সময়ই প্রহসনই হয়ে দাঁড়ায়। সেকথা ব্যবসায়ীরাও জানেন, জানেন হরিনাথপুরের উকিল, মোক্তার, মুহুরিরা এবং জানেন হাকিমেরাও।

প্যানা যদিও মাত্র বছর কয়েক হল এই লাইনে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে পুরো ব্যাপারটার ক্রিয়াকাণ্ডর অসারতা তাকে বিরক্ত করে তুলেছে। এই থোর-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোরের কাজ তার আর ভাল লাগে না। তাছাড়া, যাকে ইংরিজিতে "প্রডাকটিভ" কাজ বলে, একাজকে তেমন আদৌ মনে হয়না। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়র, সায়ান্টিস্ট হলেও না হয় কথা ছিল।

যখন কোনও হাকিম অত্যাচার করেন কোনও ব্যবসায়ীর ওপরে, সে যে কারণেই হোক ; তখন সেই অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টার মধ্যে একটা কিছু করার মতো করছে বলে মনে হয় তার। প্রতিবাদী কাজ। অন্যায়ের অপসরণের কাজ। তখন ওর ভাল লাগে একটু। এইসব ব্যতিক্রমী কারণ ছাড়া, যতই দিন যাচ্ছে, এই কাজে তার উৎসাহ চলে যাচ্ছে। যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হয়ে বা উকিল হয়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস করতে পারত, ট্রাইব্যুনালে অথবা হাইকোর্টে সওয়াল জবাব করতে পারত ; তবে না হয় হত। কিছু একটা করছে বলে, মনে করতে পারত। এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোপিনাথপুরের গর্তে বসে, খাটা-পায়খানার গন্ধে, মশার ভনভনানি আর সাইকেল রিকশার প্যাক-প্যাকানি, শুনতে শুনতে, দিনের পর দিন গ্রস-মুনাফার স্টেটমেন্ট, পার্টনারশিপের একইরকম দলিল, আর লস এর এক্সপ্লানেশান ; কল্পিত-জবাবদিহি, এই সব লিখতে লিখতে প্যানা সত্যিই

ক্লান্ত ও বিরক্ত।

প্যানার সঙ্গে তার ভাগ্যই বিড়ম্বনা করেছে। ছেলেবেলার দিনগুলো, হাজারিবাগের স্কুলের কথা, মনে পড়ে। ওদের বাড়ি ছিল হাজারিবাগ শহরের পাগ্মল-এ। ছেলেবেলাতে বাবা-মার কাছে কত আদর পেয়েছিল, সেই সব কথা। কাকাদের অনাদরের কথাও মনে পড়ে।

টাকা, বিশেষ করে ঠকিয়ে-নেওয়া, বা চুরি-করা টাকা, মানুষকে যে কত সহজেই অমানুষ করে তোলে, তা সে শিশুকাল থেকেই জেনেছে। অর্থহীন, সম্বলহীন হয়ে, তঞ্চকদের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে, অসহায় অবস্থাতে পড়ে, প্যানা এও বুঝেছে যে, টাকার গর্বে তারাই শুধু গর্বিত হতে পারে ; যাদের জীবনে গর্ব করার মত আর কিছু মাত্রই নেই। তাদের সমস্ত জগতটাই টাকাময়। মানসিক জগতও। সবকিছুরই বিচার এবং মূল্য সেইসব মানুষে শুধুমাত্র টাকা দিয়েই দেয় এবং করে। তেমন মানুষদের, প্যানা ঘৃণা করে।

বেঁচে থাকার জন্যে টাকার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবু এই টাকার চক্করে, টাকার দুনিয়াতে, ফেঁসে যাওয়াতে ওর মনে, মাঝে মাঝেই বড় ধিক্কার ওঠে।

কিন্তু কি করবে? জীবিকা হিসেবে এই কাজ ছাড়া অন্যকিছুই যে, সে শেখেনি। বি. কম. পড়তে পড়তে বাণিজ্য বিষয়টাকে তার খারাপ লাগেনি। অ্যাকাউন্টস আর এই জগতের একেবারে গভীরে প্রবেশ করার পরে, এই জগতের ভিতরের রূপ দেখে, তার মনের মধ্যে যে সব সুকুমার বৃত্তি ছিল সেগুলো কঁকিয়ে কেঁদে মরছে।

মুক্তি চায় প্যানা এই নগেন সাহাদের, নসু মোক্তারদের আর বড় হাকিম, মেজ হাকিম, সেজ হাকিম আর ছোট হাকিমদের কাছ থেকে ; এই তুচ্ছ, টাকা-মলিন জগত থেকে।

এখন সকাল। এগারোটা। ইনকামট্যাক্স অফিসের পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। কার্তিকের রোদ। বড় হাকিমের গাঢ় সবুজ-রঙা, ফুলহাতা-সোয়েটারের ঠিক বুকের উপরে এসে পড়েছে রোদ। মেঝে থেকে পিছলে উঠে, সোয়েটারের হাতের কাছে সাদা বর্ডার দেওয়া ; তাঁর শালীর বুনে-দেওয়া।

প্রত্যেক জামাইবাবুরই কিছু কিছু PREROGATIVES থাকে। তার মধ্যে, তরুণী শালীর হাতে-বোনা নরম সোয়েটার অন্যতম।

ইনকামট্যাক্স অফিসটা একটা অনেকদিনের পুরনো বাড়িতে। বড় বড় ঘর, উঁচু সিলিং, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে। তবে, অনেকখানি জমি আছে বাড়িটার চারিদিকে।

সামনেও মস্ত মাঠ। লোকে বলে, বাবুর মাঠ। কোন বাবুর তা কে জানে!

বাড়ির হাতার মধ্যে, আম, ফলসা, আর জারুল গাছ আছে কয়েকটা। একটা মস্ত বড় কালোজাম গাছও আছে। কার্তিকের নরম রোদে, তাদের পাতারা থেকে থেকে হিমেল হাওয়ায় দুলছে এখন। ঝিলমিল করে উঠছে। পিছনের দিকে একটা প্রাচীন জলপাইগাছও আছে। এইসব বড় গাছগুলি খুবই প্রিয় প্যানার। তাদের নীচে গেলেই ওর মনে হয়, যেন মৃতা মায়ের কোলের কাছে গেল।

বাড়িটার হাতাময় মুথা ঘাসে ভরে থাকে এখন। বর্ষাতে গজায়, তারপর ভরে যায় ; তারও পর আস্তে আস্তে শীত পেরুলে বসন্তে পাতলা হয় ; তারপর গ্রীষ্মের প্রথমেই মরে যায়, মানুষের পায়ের চাপে, সাইকেল রিকশা ও গাড়ির চাকার ঘষায়।

পূর্ণর মনে হয়, মানুষের জীবনও এমন হতে পারত। প্রতি শীতে বা গ্রীষ্মে মরে গিয়ে, বর্ষায় বা বসন্তে বেঁচে উঠতে পারলে কি মজাই না হ'ত।

মোটরগাড়ি হরিনাথপুরে খুব বেশি নেই। গাড়ি বেশি না থাকলে কি হয়, হরিনাথপুরে যে পরিমাণ কাঁচাটাকা আর সোনাদানা আছে তা কলকাতার কম অভিজাত পাড়াতেই পাওয়া যাবে। এখানকার ফতুয়া-পরা, ছেঁড়া-আলোয়ান গায়ে-দেওয়া মানুষগুলো, টাকা করেছে অনেকই, কিন্তু টাকার ব্যবহার জানেনি। টাকা দিয়ে যে বই কেনা যায়, কেনা যায়, ভাল ভাল রেকর্ড, ছবি আঁকার সরঞ্জাম; গরীবের জন্য কুঁয়ো খোঁড়া যায়, দাতব্য হাসপাতাল করা যায়, সেসব এরা জানেনা। শুধু টাকার জন্যই টাকা বানায় আর টাকার গরবে ভেতরে ভেতরে তেতে থাকে সবসময়। ভাব এমন, যেন টাকাটাই জীবনের সর্বস্ব।

ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট কোনও খোঁজই রাখেন না, কোথায় কোথায় টাকার আড়ৎ। কাদের কত আয়? যারা ট্যাক্সো দেন, তাদেরই ওপর কামান দেগে আসছেন তাঁরা চিরদিন। আর যাঁরা একেবারেই দেননা, অথবা নামমাত্র ঠেকান; তাঁদের দিকে ফিরেও তাকান না।

ইন্সপেকটর হরিষবাবু ঘরে ঢুকলেন ফাইল বগলে নিয়ে। বড় হাকিম নগেন সাহা ফাইল থেকে মুখ তুলে বললেন, হল, রিপোর্টটা?

হ্যাঁ স্যার।

কত বড় বাড়ি?

তিনতলা।

খরচ কত দেখিয়েছে?

দেড় লাখ।

ক' বছরে কনস্ট্রাকশন হয়েছে?

দেড় বছরে।

পর্সোনাল সুপারভিশনে করা, না কনট্র্যাক্টরে করেছে?

পার্সোনাল সুপারভিশনে।

হুম্‌ম্‌।

সঙ্গে ওভারসিয়ার নিয়ে গেছিলে?

না স্যার।

না, কেন? তুমি নিজেই ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেলে নাকি? আন্দাজিফাই করে তোমরা কনস্ট্রাকশনের রিপোর্ট দেবে, আর সেই রিপোর্টের বেসিসে অ্যাডিশান করব আমি, আর ঘোষাকি, আমাকে বুদ্ধু বানিয়ে আপিলে গিয়ে সব ছাড়িয়ে নেবেন। এই ত হয়ে আসছে বরাবর।

"ঘোষাকি" হল গিয়ে, ঘনশ্যাম ঘোষ উকিলের ইনকামট্যাক্স জগতের নাম। ওঁর সামনে যদিও কেউ ও নামে ডাকেনা কিন্তু আড়ালে, হাকিম, মুহুরি, মক্কেল বেয়ারা, সকলেই ডাকে।

ঘোষাকির চেহারাটা নাদুস-নুদুস। ফর্সা। চেইন-স্মোকার। ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা, সিগারেটের আগুনের তাপে হলুদ হয়ে গেছে। নীচু-স্বরে কথা কন। ঘোড়েল নাম্বার ওয়ান। বিরাট পয়সা করে নিয়েছেন। প্রাসাদোপম বাড়ি। গাড়ি। পার্টি-টার্টিও করেন। মানে, গোপিনাথপুরের কোনো ব্যাপারই ঘোষাকি ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। সে অমিতকুমার নাইটই হোক কি সত্যজিৎ রায় রেট্রোসপেকটিভ হোক অথবা "সতীর সান্ত্বনা" যাত্রাই হোক। গত মাসেই কুস্তী স্পনসর করেছিলেন তিনি মহেশ তলার মাঠে। পঙ্গির সাঁতারের প্রতিযোগিতা অথবা ঘোঘড়ার মাঠে আটচল্লিশ ঘন্টা সাইকেল-চালনা প্রতিযোগিতা এই সবেরই পেছনে ঘোষাকি আছেন। চিফ প্যাট্রন। গোপিনাথপুরে বাস করে, ঘোষাকিকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য সাধারণ লোকত দূরস্থান, হাকিমদেরও নেই। কলকাতার আই. এ. সি বা কমিশনাররাও সবই ঘোষাকির হাতের মুঠোতে। ঘোষাকিকে এখানের সব হাকিমেরা, বড় হাকিম, মেজ হাকিম, ছোট হাকিম সকলেই তাই খাতির করে চলেন।

তবে, ঘোষাকি মানুষটা বাইরের ব্যবহারে একেবারে নিপাট ভাল মানুষ। মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। প্রাগম্যাটিক, কোল্যাপসিবল্‌ বিবেকের মানুষ। যেখানে যা করার তাই করেন। এমনিতে সতীই তবে অসতী হতেও গররাজী নন, কার্যসিদ্ধির জন্যে।

বড় হাকিমের কথা শুনতে শুনতেই, নসু মোক্তার সশব্দে নস্যি নিলেন দুই নাকে। তারপর আরও বেশি শব্দ করে দুই নাকই ঝাড়লেন খয়েরী কাপড়ের

টুকরো দিয়ে। তাঁর স্ত্রীর ছেঁড়া শাড়ির টুকরো, গোল্লা পাকিয়ে, সবসময়েই পকেটে রাখেন।

যতক্ষণ এইসব প্রক্রিয়া চলল, ততক্ষণ পূর্ণ মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রইল। নস্যির গুঁড়ো ওর দিকে উড়ে এলেও খুবই অস্বস্তি হয় ওর। সহ্য করতে পারে না নস্যির গন্ধ।

বড় হাকিম, কথাকটি বললেন, আসলে, নসু মোক্তার আর প্যানাকে শোনাবার জন্যেই। ঘোষাকিই নসু মোক্তারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এই হরিনাথপুরের ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে। তিনি উকিল। গাদনের সাব-জজের কোর্টের পশার ছেড়ে বছর দশেক হল হরিনাথপুরে মাটি কামড়ে, ইনকামট্যাক্স প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। অ্যাকাউন্টস কিছুই বোঝেন না। কিন্তু আইনটা ভাল বোঝেন। ইংরিজিটাও নসু মোক্তারের চেয়ে অনেকই ভাল জানেন। তবে তিনি চারজনকে রেখেছেন মাইনে করে। তাঁরা সকলেই দুঁদে লোক। অ্যাকাউন্টস খুবই ভাল বোঝেন। নসু মোক্তার, তাঁদের একজনকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হননি। তাঁর সামর্থ্যও নেই।

কথাটা, বড় হাকিম, হরিশ ইনসপেকটরবাবুকে বললেন বটে, নসু মোক্তারকে শুনিয়ে শুনিয়ে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন এবং নসু মোক্তার এবং প্যানাও বিলক্ষণ জানে যে, যার রিপোর্টই হরিষবাবু আনুন না কেন, তাঁকে, নেহাৎ বুদ্ধু না হলে "গুড হিউমার"-এ রেখেছেন নিশ্চয়ই সেই পার্টি। এবং হাকিমকেও রাখবেন।

অবশ্যই।

"গুড হিউমার" কথাটা ঘোষাকি খুবই ব্যবহার করেন। এই "গুড হিউমার" মানেই যে ঘুষ-ঘাষ এমনও নয়। কোনো হাকিম ক্রিকেটভক্ত, তার জন্য টেস্ট ক্রিকেটের টিকিট যোগাড় করে, কলকাতায়, থাকার বন্দোবস্ত করে ; যাতায়াতের টিকিট কেটে দেন। যিনি মাছ ধরতে ভালবাসেন, তাঁর জন্য মাছধরার এবং খাওয়া দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত করেন। মাছ যদি একটিও ধরতে নাও পারেন, হাকিম বা ইনসপেকটর; তবে জাল ফেলিয়ে বড় মাছ তুলে দিয়ে দেন। যিনি সঙ্গীতরসিক তাঁর জন্য সদারঙ্গ বা ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের সীজন-টিকিট কেটে কলকাতায় থাকা, খাওয়া, গাড়ির সব বন্দোবস্ত করে দেন। যিনি মদ খেতে ভালবাসেন, তাঁর জন্য নানারকম মদ যোগাড় করে দেন। যিনি বই পড়তে ভালবাসেন, তাঁর জন্য বই। এই হল, "গুড হিউমার"।

এই "গুড হিউমারে" রাখা বা থাকা কোনো খারাপ ব্যাপার নয়। দোষেরও

নয়। যাঁরই হাতে কলম আর পেছনে চেয়ার, তাঁকে খুশি দেখতে কারই বা না ভাল লাগে। এটুকু তো মানুষ এমনিতেই অন্যের জন্যে করেন, যাঁদের করার সামর্থ্য আছে।

সুখের কথাটা এই যে, এখনও দেশে প্রচুর সৎ লোক আছেন। সব ক্ষেত্রেই। তাঁরা আছেন বলেই, দেশটা এখনও চলছে। নইলে, থেমেই যেত। আইনের জগতে ঢুকে, পূর্ণ বুঝেছে যে ; আজও ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সেই উক্তি একশভাগই সত্যি আছে এই দেশে। "আইন। সে তো তামাশামাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।"

আইন সত্যিই সার্কাস। এখনও তাই আছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বেশি ও বড় তামাশা হবে।

ইনসপেকটর হরিষবাবু রিপোর্টশুদ্ধু ফাইলটা রেখে চলে গেলেন।

বড় হাকিম, ব্যালান্সশিটের লায়াবিলিটির লিস্ট দেখতে দেখতে এক জায়গাতে এসেই থেমে গেলেন।

বললেন, সুন্দরীবালা দাসীটি কে?

অপ্রস্তুত হলেই নসু মোক্তারের ডান কানটা পাঁঠার কানের মতন রিফ্লেক্স অ্যাকশনে দু-তিনবার নড়েচড়ে ওঠে। নসু মোক্তার একটু অপ্রস্তুত হলেন।

বড় হাকিম বললেন, পনের হাজার টাকা জমা এঁর নামে। তা ফাইল আছে কি? জি. আই. আর নাম্বার কত?

আজ্ঞে না স্যার। ফাইল নেই।

তবে? সেকশান ওয়ান থার্টি ওয়ানে ডেকে পাঠাই?

না স্যার।

বড় হাকিম চশমাটা টেবিলে খুলে রেখে, ডিবে থেকে পান বার করে, মুখে নিলেন। একসঙ্গে দুটি পান। তারপর জর্দার কৌটো থেকে, জর্দা ফেললেন মুখে। পিক ফেলার জন্য পিকদানও থাকে টেবিলে। জর্দার প্রথম পিকটা সবসময়ই ফেলে দেন উনি। ওঁর মা নাকি শিখিয়েছিলেন। আর পান, কখনও পোঁটলা করে গালে রাখেন না। অমন রাখলে, নাকি ক্যানসার হয়।

পানের পিক ফেলে, উনি বললেন, সবই 'না' স্যার হলে, 'হ্যাঁ' টা কোথায়?

নসু মোক্তার প্যানাকে বললেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো প্যানা। চা খেয়ে এসো বরং এক ভাঁড়।

প্যানা, সঙ্গে সঙ্গে ফাইলপত্র ছেড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। যখন তখন চা খায়না ও। মাঠের মধ্যে গিয়ে, রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একঝাঁক শালিক

একাদোক্কা খেলছিল। তাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার হঠাৎই জগমগির কথা মনে হল, কেন যে এমন হঠাৎ হঠাৎ জগমগির কথা মনে হয় ; কে জানে।

গতরাতে বারোঁয়া রাগের একটি ভ্যারিয়েশন শুনিয়েছিল ও। কানে বাজছিল, সেই গান। রেশ ছিল সারারাত। কে জানে। এমন কেন হয়!

পূর্ণ ভাগ্যদোষে, আজ হরিনাথপুরে ; নসু মোক্তারে মুহুরী। অতি দীনদরিদ্র পরিবেশে, প্রায় বস্তীর মধ্যেই তার বাস। কিন্তু সে কোনওদিন এমন "বড়লোকের ছেলে" ছিলনা যে, বড়লোকিই তার একমাত্র পরিচয় হত।

ভাগ্যিস!

নইলে, তার বর্তমান জীবনে নিয়ে তার আক্ষেপের আর অন্ত থাকত না। আক্ষেপ, ওর বিন্দুমাত্রই নেই। কারণ, এও ত একটা অন্য জগৎ!

ওর জগতের যতটুকু অপূর্ণতা, তা, ভরে দেয় জগমগি। ওর পড়ে-পাওয়া ধন। ওর হাতে যে সামান্য উদ্বৃত্ত সময়টুকু থাকে, তা গান বাজনা নিয়ে, বা গান-বাজনার অলোচনা করেই কাটিয়ে দেয়।

খাওয়া-পরার বাহুল্য বা বাসস্থানের চাকচিক্যই যে সব নয়, তার বাইরেও, তার উপরেও যে, অন্য এক জগত থাকে, মস্ত জগৎ ; সেই জগতের খোঁজ যারা পেয়েছে, তাদের কোনোরকম জাগতিক দুঃখই বাজেনা।

পূর্ণ, নিজেকে এই কারণে, খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করে। জীবনের প্রায় পনেরোটা বছর ও ওর শিক্ষিত, সঙ্গীতজ্ঞ কিন্তু জাগতিকার্থে "অপদার্থ" বাবার নৈকট্য, বাবার সাহচর্য পেয়েছিল। মাকে ছেলেবেলাতেই হারিয়েছিল বলেই আরও বেশি করে পেয়েছিল। তবে সে যেমন সঙ্গী ছিল বাবার, তেমনই ছিল গান-বাজনা আর মদ। সারাদিনই রাতই বাবা মদে চুর হয়ে থাকতেন। মদ যত পেতেন, তাঁর গলায় সুর তত বেশী স্থির হত। বাবার মতন এমন সুরেলা গলার সংগীত-বোদ্ধা, বড়মাপের পুরুষ গায়ককে ও বেশি শোনেনি। রেকর্ডেও নয়।

প্রথম যৌবনের সেই গান-বাজনার সাংস্কৃতিক পরিবেশই তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। নসু মোক্তার ইনকামট্যাক্স অফিস তাকে করতে পারেনি। পারবেও না কোনোদিন। সাংস্কৃতিক সব ব্যাপারেহে দীন এই হরিনাথপুরে, জগমগি ছাড়া একজন মাত্র বন্ধু আছে। তার নাম বিষাদ। রুচির মিল হয় শুধু ওরই সঙ্গে। গান-বাজনা বই-পত্র, সাহিত্য, ছবি এসব নিয়ে কেউ আলোচনা করে না হরিনাথপুরের পরিচিত জগতে। এখানে আসামাত্র জগমগিকে পেয়ে যাবে, এমন করে তার মনের শূন্যতা পূর্ণ করতে, তা কখনও ভাবেনি। জগমগি না থাকলে, কি করে যে থাকত এখানে ; এই মর্জিবাজ নসুমোক্তারের খিদমদগরি করে, তা সত্যিই ও

জানে না।

বড় হাকিম পান চিবোতে চিবোতে বললেন, সুন্দরীবালা দাসীর ঠিকানাটা কি?

রাণীর হাট স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে একটি রহস্যময় হাসি, মুখময় ছড়িয়ে গেল বড় হাকিমের।

বললেন, বয়স কত? মাগী?

না, না। ঠিক মাগী নয়।

বিব্রত গলাতে বললেন, নসু মোক্তার।

মাগী নয়তো কি? রাণীর হাটে কি সতীলক্ষ্মীরা থাকে?

তা, স্যার বয়স এখন তিরিশ মতো হবে। অপরূপ সুন্দরী। নগেনবাবুর রাখন্তি।

রাখন্তি? সেটা আবার কি?

"কেপ্ট" স্যার। রক্ষিতা। নগেনবাবুর রাখনি। পনেরো বছর বয়স থেকেই ওকে রেখেছেন। এত খাটাখাটনি যায়, এত টাকা রোজগার করেন ; ফুরিয়ে-যাওয়া জীবনীশক্তি নতুন তো করতে হয়।

বাড়িতে বউ নেই নাকি?

তা থাকবেনা কেন স্যার? বাড়িতে বউ কার না থাকে?

তবে?

কিন্তু স্যার, তাদের যা বায়না। সবেতেই তাদের যা "না, না....."

আর ওরা?

ওরা যেমন করে খুশি করতে পারে, তাকি বাড়ির বৌ পারে স্যার? বৌদের তো শুধু দাবী আর দাবী। নিজের নিজের বৌকে পাওয়ার জন্য, যে সাধনা, একজন পুরুষ করে সারা জীবনে, তা করলে, প্রত্যেক বাঙালী পুরুষ মা কালীকে পেয়ে যেত স্যার। প্রত্যেক বাঙালী স্বামীই তো সাধক, সেই অর্থে। কিন্তু দেব দেবীর মন টললেও হয়ত টলে, কিন্তু বাড়ির বৌদের মন টলে কই?

হাঃ! হাঃ! হাঃ! করে হেসে উঠলেন বড় হাকিম।

তারপর বললেন, রক্ষিতার কাছে ধন রক্ষিত রেখেছে নগেন সাহা? আর নগেন সাহার কাছে গচ্ছিত রেখেছে সে। কোন ধন?

নসু মোক্তারেরও লজ্জা হল এই প্রশ্নে।

মুখ নীচু করে বললেন, স্যার, অমন মেয়েদের তো রোজগারপাতি থাকে। তারাও তো প্রফেশনাল পার্সনস।

তা বটে! আপনিও তো প্রফেশনাল পার্সন। নগেন সাহা আপনাকেও রক্ষিত রেখেছেন আর সুন্দরীবালা দাসীকেও? সত্যি! কত্তরকমের রক্ষিতাই না হয়!

তা বলতে পারেন স্যার। তবে তফাৎ একটা আছে। মস্ত বড় তফাৎ।

কি?

প্রফেশনাল বটে, তবে আমরা মেরে খাই, আর ওরা মারিয়ে খায়।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছিঃ। এমন কথাও বলতে পারলেন নসুবাবু? ছিঃ।

একটু থেমে বললেন, তা বলুন এবারে, এই ক্রেডিট সম্বন্ধে আপনার কি বলার আছে?

এটা খুবই ডেলিকেট ব্যাপার স্যার। এটা নিয়ে নাড়াচাড়া না করলেই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। খুব ভাল করে এক্সপ্ল্যানেশান লিখে দেব। অন্য কোনও সোর্স দেখিয়ে।

সুন্দরীবালা, কি নগেন সাহার এক্সক্লুসিভ রক্ষিতা? না, অন্যদেরও যাতায়াত আছে?

তা কি আর নেই? নইলে আর পাড়ায় থাকবে কেন? ভদ্রাসনেই তো আলাদা করে রাখতেন তাকে। নগেনবাবু তো বুড়োই হয়ে গেছেন। তিনি কি আর জোয়ান মেয়ের সব চাহিদা, মানে প্রয়োজন ; ইনক্লুডিং শরীরের প্রয়োজন, মেটাতে পারেন? তারাও স্যার সবাই ছুকছুকে স্বভাবের হয়। দুপুরের বেড়ালের মতন অন্য অনেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে যাতায়াত করেন বৈ কি!

আপনিও গেছেন নাকি কখনও?

নসু মোক্তার জিভ কেটে বললেন, কি যে বলেন স্যার।

আপনি না গেছেন গেছেন, চোখের দেখাও কি দেখেননি? কখনও?

তা এক-দু'বার দেখেছি স্যার। মিথ্যে বলব না।

কেমন?

বড় হাকিম, হাসতে হাসতে বললেন।

চেহারা ছবি, ট্যাপারির মতন স্যার, দেখলেই শরীরের মধ্যে উলুক-ঝালুক করে। খারাপ মেয়েদের যেমন দেখতে হওয়া উচিত তেমনিই আর কী!

তবে.....

তবে কি?

শুধু শরীরের রূপ দিয়েই তো সৌন্দর্য হয়না স্যার। শিক্ষা, সহবৎ, পারিবারিক পটভূমি একজন মানুষকে যে সৌন্দর্য দেয়, তা কি শুধু শরীর দিতে পারে? কয়েক পাত্তর চড়িয়ে, শুধু শরীরের চাহিদা মেটানোই যেতে পারে ঐ সব মেয়েদের দিয়ে। নেশা নেমে গেলে, তাদের রূপের ছটাও ম্লান হয়ে যায়।

বাঃ, ভাল বলেছেন তো কথাটা নসুবাবু। তা এইটুকু বলার জন্য আপনি

পূর্ণকে বাইরে পাঠালেন কেন? আমি তো ভেবেছিলাম বেশ রসের গল্প বলবেন আমাকে। কি না কি ভাবছে ছেলেটা?

কী দরকার? গেছে গেছে, ভালই হয়েছে। আমার আপনার মধ্যে যে কথা হল, হল। পূর্ণ ছেলেমানুষ। তাছাড়া, ছেলেটার মতিগতি একটুও বুঝিনা। ওর মধ্যে একটা ছন্নছাড়া, সন্নিসী আছে। নইলে ও আমার সেরেস্তার সর্বেসবা। অনেক পয়সাই বানিয়ে নিতে পারত এতদিনে। তাছাড়া, টাকার জন্যেই তো কাজ করা! অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে একটা এই প্যানা। মক্কেলদের টাকা পয়সার হিসেব নিয়েই ওর কারবার অথচ টাকা পয়সার ওপর কোনও লোভই নেই। এবং সেইজন্যই ওকে বিশ্বাস করিনা আমি।

তাছাড়া, জগমগি বলে একটা মেয়ের সঙ্গেও ওর খুব ভাব। গান-বাজনা করে তার সঙ্গে।

কোথায়? বাইজী বাড়ি যায় নাকি?

এখানে বাইজী?

না, না, ওর উলেটাদিকের ঘরেই থাকে জগমগি। নাথু ভোগতার বৌ সে।

সবই গুলিয়ে দিলেন।

থাক যা বললাম আমি আপনাকে, তা যদি ও নগেন সাহাকে বলে দেয়, তাহলেই আমার হয়ে গেল। নগেন সাহার হাত-জোড় করা রূপই তো দেখেছেন স্যার আপনি। আপনাদের কাছে সব মক্কেলরাই তো ঐ রূপেই আসেন। কিন্তু তাদের আসল রূপ যে কি, তা নসু মোক্তারই জানে।

সুন্দরীর কথা আপনাকে বলেছি জানলে, হয়তো আমাকে ধমকে বলতেন, না হয়, পনের হাজার টাকার ওপর ট্যাক্সোই দিতাম! রিটার্ন-এর পার্ট ফোর-এ না হয় ঢুকিয়েই দিতেন টাকাটা। নিজের ইজ্জতের চেয়েও কি পয়সাই বড় হল মহায়?

একটু চুপ করে থেকে, নসু মোক্তার বললেন, আসলে টাকাটাই বড়। তবু বক্তৃতা দেওয়ার চান্স পেলে আর ছাড়ে কে?

বড় হাকিম, এবারে আরেকবার পানের পিক ফেলে হাসলেন। বললেন, সে কি মশায়! এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! টাকাকেই ইজ্জত বলে জানে বড়লোকেরা। টাকাই যাদের একমাত্র ইজ্জত, টাকা গেলেই তো তারা বে-ইজ্জত। আর কি বাকি থাকে?

সে কথা ঠিক। কিন্তু কি দরকার স্যার। আপনাকে যা বলা, বা করা মানায়, তা কি আমাকে মানায়? সুন্দরীর তো একজনই বাবু। আমার যে কত এবং

কতরকম বাবু নিয়ে কারবার করতে হয়, তা কি বলব আপনাকে স্যার। উকিলের পশারটা, বাড়িটা ; গাড়িটাই সকলে দেখে। তাদের যে সর্বক্ষণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতকিছুই করতে হয় ; তা যদি কেউ জানত।

বড় হাকিম মানুষটি ভাল। সৎ এবং দিল-খোলাও বটে।

ভাবছিলেন, কথা বলতে বলতে ; নসু মোক্তার।

এবং ভাল বলেই ; এত কথা ওঁকে বলা যায়।

বড় হাকিম বললেন, তা অবশ্য ঠিক। আমাদের মধ্যেও তো সকলে সমান নই। আমাকেই কি আপনার পছন্দ? যে ভয়-ভক্তি, সেলাম-ইজ্জত, তাও হয়তো ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আপনাদের দেখাতে হয় ; করতে হয়।

তা হয়ত হয়। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই হয়। তবে আপনার কথা আলাদা। কিন্তু এটাই তো কাজ আমাদের। প্রত্যেক চেয়ারেরই একটা আলাদা ইজ্জত থাকে। তবে অনেকেই নিজেতে আর চেয়ারে তফাৎ করতে পারেন না। রিটায়ারমেন্টের পরে তাঁদেরই হয় সবথেকে বিপদ। কিন্তু, আপনি তো তাঁদের মত নন স্যার।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাছাড়া, মক্কেলদের কথা ভেবেও আমাদের মাথা ঝোঁকাতেই হয়। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা উঁচু করে চলা যায়, উল্টোপাল্টা বললে, লোককে থাপ্পড়ও কষিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আপনারা হলেন হুজুর মা-বাপ। একটু বেচাল হলেই তো মক্কেলের ওপর আসবে চোটটা। মক্কেল বাঁচলেই না আমরা বাঁচব। তাই ওকালতি করতে, ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার! আমাদের করতেই হয়। বিশেষ করে, আজকালকার দিনে। মক্কেলরাও ত আর ধোওয়া তুলসী পাতা নয় সকলে। আপনাদের ন্যায়-অন্যায় বিচারের অধিকারও তো আমাদের নেই। তাছাড়া, আবারও বলছি স্যার; সবাই তো আপনার মত নন। আপনার মত ভাল, অনেস্ট, বুঝদার মানুষ সব হাকিম হলে, আর দুঃখ ছিল কি?

আচ্ছা, এবারে ডাকুন পূর্ণকে। ও হয়ত ভাবছে, সুন্দরীবালা দাসীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টই করছেন বুঝি আপনি, আমার জন্য। ডাকুন! ডাকুন!

হ্যাঁ স্যার।

এমন সময় হাকিমের বেয়ারা খগেন ঢুকলো ঘরে, চা নিয়ে।

হাকিম বললেন, এই যে খগেন, দ্যাখো তো পূর্ণবাবু কোথায় গেলেন? তাকে বলো, বাইরে চা খেতে হবেনা। এখানেই তুমি চা নিয়ে এসেছ।

হ্যাঁ স্যার।

খগেন বলল।

বলেই, বাইরে গেল।

আজকে ছুটি। রবিবার। হাটও আছে আজ। প্যানার, অর্থাৎ পূর্ণ রায়-এর ঘুম ভাঙলো পুবদিকের ভেজিয়ে-রাখা জানালার ফাঁক দিয়ে আসা, কমলারঙা রোদের আলোর একটি তির্যক রেখা চোখের উপরে পড়াতে।

বাইরে থেকে চাপা শোরগোল আসছিল।

ঠিক শোরগোল নয়, শীতের রবিবারের সকালের মিশ্র শব্দ।

সজনের ডালে হলুদবসন্ত পাখি স্বগতোক্তি করছে। প্যানার কুকুর বিল্টু ভুউক ভুউক করে পথের কোন কুকুরী দেখে কাঁকুড়ে ধুলোয় খচরমচর শব্দ তুলে ছুটে গেল।

দোষ নেই। মাসটা, কার্তিক। এখন কুকুরদের আর পাখি শিকারীদেরই মরশুম।

প্যানা, পাশ ফিরে শুল।

আরও একটু শুয়ে থাকবে। শীতের সকালে এই জেগে শুয়ে থাকাটাই সম্ভবতঃ ওর একমাত্র বিলাস। বিলাস বলতে সত্যিই ওর আর অন্য কিছুই নেই।

কত কী ভাবে ও, এই নিরুপদ্রব, দাবীহীন সময়টুকুতে। তবে, অতীতের কথা ভাবে না বিশেষ। কারণ, ওর অতীত বলতে তেমন কিছুই আর নেই। অতীত পতিত। ভবিষ্যৎ বলতেও যে তেমন কিছু আছে, তাও নয়।

সেটা আরওই দুঃখের।

সময় কোথায়? নসু মোক্তার তার রক্ত খেয়ে নেয়। শুধু রক্তই নয়; মাংস, হাড়ের মজ্জা শুদ্ধু খায়। প্যানা ইদানীং বুঝতে পারে যে, নসু মোক্তার আদৌ চায় না যে, ও নিজে স্বাবলম্বী হোক। হলেই তো নিজপায়ে দৌড়ে ও ভেগে যেতে পারে। নিজে আলাদা প্র্যাকটিস করতে পারে। আর তা যদি করে, তাহলে

নসু মোক্তারের দুই যমজ ছেলে, লালু ও ভুলু; যারা এখন স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র; নসু মোক্তারের পশার পাবে কি করে?

হাউ উইল দে স্টেপ ইনটু দেয়ার ফাদারস শুজ?

নসু মোক্তারের খান্ডার স্ত্রীরই বা কি করে চলবে? তাঁর চাহিদাও তো কম নয়! দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বয়সে, তিনি প্যানার চেয়েও ছোট হবেন। তবে এ-কথা বলতে হবে, মহিলা দেখতে ভাল। ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছিলেন নাকি রাধানগর কলেজে। রাধানগরের কাদেরপাড়ায় বাড়ি ওঁদের। নাম মোহিনী।

একটা বাচ্চা ছেলে চিৎকার করে উঠল। শুনতে পেল প্যানা, বন্ধ দরজার ফাঁক থেকে। নিশ্চয়ই দাওয়াতে, রোদের মধ্যে পাটি পেতে, মুড়ি-মুড়কি খাচ্ছিল আর তা দেখে, কাক নেমেছে। উল্টোদিকের ঘরের বনবিহারীবাবুর ছোট ছেলে সে। বনবিহারীবাবু, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের চাপরাসী।

শিশুর কান্না শুনে, প্যানার কুকুর বিলটু দৌড়ে ফিরে এল ভুউক ভুউক করে, পথের কুকুরীর মোহ কাটিয়ে।

ডানদিকের ঘরে থাকে নাথুলাল ভোগতা। সে গোপিনাথপুরের ট্রেজারীর চৌকিদার। বিহারের দারভাঙ্গা জেলাতে বাড়ি। তার বউ-এর নামই জগমগি। জগমগি। নাম শুনলেই, মিঞা তানসেনের বিখ্যাত গানের কথা মনে আসে। "দিয়া জ্বালাও, জগমগ জগমগ, দিয়া জ্বালাও"।

তা, মিঞা তানসেন যেমন ঐ গান গেয়ে আগুন জ্বালাতে পারতেন, জগমগি গান না গেয়েই, শুধু তার চোখের ঠারে ; যৌবনের অসহ্য তাপেও যে-কোন পুরুষের শরীর মনে আগুন জ্বালাতে পারে। ওদের ছেলে মেয়ে নেই। ভারী হাসিখুশি জগমগি। ভাল আত্মার মেয়ে। মুখের মধ্যেই সেই ভালত্বর ছাপ আছে। জগমগির মধ্যে যে, পুরুষের শরীর-মনে আগুন জ্বালাবার অমন বিধ্বংসী ক্ষমতা আছে, সে সম্বন্ধে ও নিজে সচেতন নয়। ওর রূপ নিয়ে জগমগির কোনই দেমাক নেই। জগমগি যে রূপসী, সে সম্বন্ধেও বোধহয় ওর কোন ধারণাই নেই।

প্যানার মনে হয়, নাথুদার ঘরে, সম্ভবতঃ কোন আয়নাও নেই যাতে জগমগি তার রূপকে প্রতিসরিত দেখে, তার রূপ সম্বন্ধে অবহিত, সচেতন হতে পারে। অবশ্য, অগণ্য পুরুষের চোখের আয়নাতেও সে প্রতিদিন নিজেকে দেখতে পায় না, এমন মনে করারও কোন মানে নেই।

প্রায়ই ভাবে প্যানা যে, জগমগিকে একটা আয়না কিনে দেবে।

বাঁদিকের ঘরে থাকেন বৃদ্ধ কিন্তু অকৃতদার গোপিনাথবাবু এবং তাঁর অতিবৃদ্ধা অশক্ত মা। গোপিনাথবাবু, হনুমানলাল জৈন-এর গদীতে খাতা লেখেন। কাজ

ছাড়া কিছুই বোঝেন না। আর নিজের মা ছাড়া । লোকে বলে,- যৌবনে গোপিনাথবাবুর সঙ্গে একজনের আসনাই ছিল। তাঁর বিয়ে হয়েছে এই গোপিনাথপুরেই। তাই নিজের দেশ বাঁকড়ো ছেড়ে তিনি এই গোপিনাথপুরে এসে থিতু হয়েছেন। কোন গোপিনাথের নামে এ জায়গার নামকরণ হয়েছে তা কে জানে। তবে তিনি তালের ব্যক্তি অবশ্যই হবেন। সেই তুলনায় এই গোপিনাথবাবু বড়ই নিষ্প্রভ। এরা আছেন বলেই, ওঁদের ওজন।

চারদিকে এই চার ঘর। মধ্যে উঠোন। মাটির উঠোন। ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া। সজনে গাছ, মাদার গাছ, রাধাচূড়া, গেটের দু'পাশে দুটি কাঠটগরের গাছ। ফুল ফোটে অনেকই। গন্ধ নেই। বড় হাকিমের স্ত্রীর মতন। ভদ্রমহিলা সুন্দরী। কিন্তু কি যেন নেই। গন্ধ নেই। কাঠ কাঠ। হাসেনও না। তাই, কাঠটগরের কথা মনে হয় প্যানার, তাঁকে দেখলেই।

হাকিম কিন্তু স্ত্রীর ঠিক উল্টো। সবসময়ই হাসিখুশি। অনবরত পান খান, জর্দা দিয়ে। মুখ দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়।

এত মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে প্যানা মুহুরী ভুলেই গেছিল যে, আজকেই সকালের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে আই. এ. সি. অর্থাৎ ইনসপেকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আসছেন কলকাতা থেকে। ইনসপেকশানে। সার্কিট হাউসেই উঠবেন। তাঁকে রিসিভ করতে বড়, মেজ এবং ছোট হাকিমেরা সবাইই যাবেন, তাঁদের ইনসপেক্টরেরা, চাপরাশীরা, এবং নসু মোক্তার, ঘোষাকিও যাবেন। তবে ইচ্ছা করেই এবারে তিনি গা-আলগা করে আছেন। কেন যে তা প্যানা জানেনা।

সার্কিট হাউসেই দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা সেরে হনুমানলাল জৈন-এর ফোর্ড গাড়িতে করে ঘাঁতির কাছে নদীর পাশের কোন ছোট্ট বাংলোয় রাতটা থাকবেন তিনি। তাঁর পাখি মারার শখ আছে নাকি। কিন্তু সে অঞ্চলে দু-একটি পথ-ভোলা শামুকখোল আর ডজন খানেক গো-বক ছাড়া অন্য কোন পাখি আছে বলে তো শোনেনি কখনও প্যানা। চোখেও দেখেনি।

ঘাঁতির এক বড় মক্কেলের রিটার্ন ফিল-আপ করার জন্য তাকে নসু মোক্তার সাইকেলে করে প্রতিবছরই পাঠান এবং প্যানা রাঠোরদের ঘন বনের পাশ দিয়ে, চোতরা পাতা আর চোরকাঁটার বন পেরিয়ে যে পায়েচলা পথটি চলে গেছে, তা দিয়েই কখনও সাইকেল চালিয়ে, কখনও বা সাইকেল ঠেলে বা কোলে তুলে নিয়ে পৌঁছয় প্রতিবছর।

যেহেতু তাঁদের খাতা বন্ধ হয় শ্রাবণী- পূর্ণিমাতে, বছরের এই সময়টাতেই রিটার্ন ভরতে যেতে হয়। পাখির বংশ দেখেনি কোথাওই। নদীতেও নয়। তাই,

প্যানা বোকা হলেও বুঝেছে যে, আকাশের পাখি নয়, হয়ত অন্য কোন পাখির জন্যেই এই ইন্তেজাম। দু'পেয়ে, কোমল, নরম অন্যরকম কোনও পাখিও হতে পারে।

ভাল খাওয়া দাওয়াও অবশ্যই হবে। মিষ্টি। "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"।

কোন মক্কেলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে, নসু মোক্তার এই "ইন্তেজাম" পাকা করছেন তা দেখেই প্যানা বুঝবে কার 'কেস'-এর জন্যে এই হরকৎ। ওর মন বলছে, হনুমানলালেরই কেসের জন্যে। তার পার্টনারশিপের রেজিস্ট্রেশনের কেস আটকে আছে বড় হাকিমের ঘরে। আই. এ. সি. অর্থাৎ ইনসপেক্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া এ কেস উনি করতে পারবেন না বলাতেই, আই. এ. সি. সাহেব কলকাতা থেকে এত কষ্ট করে সকালের সাতটা পাঁচের ট্রেনের চেপে গোপিনাথপুরে আসছেন।

সঙ্গে অবশ্য তাঁর চাপরাশী আর স্টেনোগ্রাফারও আসবেন।

নসু মোক্তার গত সপ্তাহের মাঝামাঝি, কলকাতা গিয়ে, বড় সাহেবের সঙ্গে অগ্রিম দেখা করে এসেছেন। জানিয়ে এসেছেন বড়সাহেবকে যে, রাণাঘাটের ছানাবড়া, রাধানগরের সরপুরিয়া, দহরমপুরের তিলে খাজা, ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকবে। মেমসাহেবের ফরমাস হয়েছে কয়েকটি সিল্কের শাড়ির আর একটি শোলার দুগগা প্রতিমার। তাও হবে। নো প্রবলেম।

চৈত্রমাসে এলে বগারীপাখিও খাওয়াতে পারতেন। রোস্ট।

তবে, আই. এ. সি. নেকুনিকেতন বা গলাগলিতে যাবেন না।

কারণ, সে সব অন্য জেলাতে। ওঁর, এক্তিয়ারের বাইরে।

হাজারীবাগের হালিমমিঞা শিকারী, একবার বলেছিল প্যানাকে যে; বাঘেরা নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে রাখে গাছে গাছে পেচ্ছাপ করে। সেই গন্ধেই টের পায় অন্য বাঘ যে, সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই। ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই আর কী! এঁরাও ত বাঘই! মনে হয়, প্যানার।

এবারে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। লেপটাকে সরিয়ে, উঠে পড়ে, জানলা দুটোকে পুরো খুলে দিল। সকালের রোদে, তার সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের মাটির আর ছ্যাঁচা-বাঁশের ঘর ভরে গেল। স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকার শীতের রাতের পরে হঠাৎই খুশি হয়ে উঠল মনটা।

গায়ে-দেওয়া ছাইরঙা আলোয়ানটা বালিশের নীচে ভাঁজ করে রাখে প্যানা, সারা রাত। 'ইস্তিরী' হয়ে যাবে ভেবে। কিন্তু নড়াচরাতে, সরে-নড়ে যায় বলেই ইস্ত্রী ত হয়ই না; উল্টে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নেয় একটা। চাদরটা ফুটোও

হয়ে গেছে অনেক জায়গাতে। কিছুই করার নেই। লুঙ্গির উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জী। তার উপরে চাদরটা পেঁচিয়ে নিয়ে খড়মটা পায়ে গলিয়ে নিমের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে কুঁয়োপারের দিকে যাবে ও, বদনা হাতে নিয়ে।

কুঁয়োটা একটু ছায়াচ্ছন্ন জায়গাতে। সূর্য মাথার উপরে না এলে, শীত করে।

দরজা খুলতেই, জগমগির সঙ্গে দেখা।

জগমগি হেসে বলল, আর চায়ের হাঙ্গামা কোরোনা প্যানাদা, আমি চা বসিয়েছি। তুমি এসো, দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে। চা দেব গরম গরম, তার সঙ্গে কাল রাতের রুটি আর মাংস দেব। ছানাবড়া রাখা আছে, তাও।

ব্যাপারটা কি? হঠাৎ......

অবাক হয়ে শুধোলো, প্যানা।

ব্যাপার কিছু নেই। কাল যে, আমার ভাসুর এসেছিল।

তিনি কোথায় থাকেন?

এখন থাকেন বোকারোতে। কয়লাখাদে কাজ করেন।

তা, নাথুদার দাদা গেল কোথায়?

ওরই সঙ্গে একটু কাজে গেছে। দাদার মেয়ের জন্যে ছেলে দেখার ব্যাপার আছে একটা।

ও।

প্যানা বলল।

জগমগি, পাটনাতে স্কুলে ক্লাস থ্রী অবধি পড়ে ছিল। একটু একটু ইংরিজিও জানে। ইয়ার্কি করে দু-একটা ইংরিজি কথা বলেও। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।

প্যানা নিজে ইংরিজিটা মোটামুটি ভালই জানে। সেটা হয়েছে, ছেলেবেলায় সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ত বলে। বাড়ির অবস্থাত খুবই ভাল ছিল। মা ত আগেই মারা গেছিলেন। প্যানার শিশুকালেই। বাবাও মারা যাওয়াতে, তালেবর, উচ্চশিক্ষিত কাকারা, মাতৃপিতৃহীন কিশোরের সব সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়ে, তাকে মামা বাড়ি রাধানগরে পাঠিয়ে দেয়। ধন-সম্পত্তিহীন প্যানার কোন 'ঠাই' হয়না মামা বাড়িতেও। অর্থ, যে অত্যন্ত নোংরা জিনিস ; তা সেদিন বোঝে ও। যাদের আছে, তাদেরও সর্বনাশ; যাদের নেই, তাদেরও।

তারপর কি করে যে সে স্কুল ফাইন্যাল ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ও বি.কম.এর একটি বছরও শেষ করে রাধানগরের সাপুই বাজারের এক মাছের

দোকানীর কর্মচারী হিসেবে, তা ওই জানে।

বাজারেই থাকত, শুত। সেই সাপুইবাবুর হিসেব-টিসেব খাতাপত্র সব রাখত। মাছও বিক্রী করত নিজে হাতে। একবার তাঁরই ইনকামট্যাক্সের কেসের সময়ে গ্রস প্রফিটের রেট কমে যাওয়াতে ও একটি এক্সপ্ল্যানেশন লিখে দিয়েছিল। তার খুবই সুখ্যাতি করেন রাধানগরের তৎকালীন হাকিম। তখন তাঁর সামনেই বসেছিলেন, গোপিনাথপুরের নসু মোক্তার। তিনি তখন সপ্তাহে দু'দিন গোপিনাথপুর থেকে রাধানগরে আসতেন। নসু মোক্তার সেদিনই দুশো টাকা বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে প্যানাকে বলেন, চলো আমার সঙ্গে। শুধু একজনের কাজ করে কতটুকু আর শিখবে? কত মক্কেল আমার, কত ধরনের ব্যবসা; কত রকম প্রবলেম তাদের। অভিজ্ঞতা হবে, শিখবে, তারপর বি. কমটা পাশ করে নিতে পারলেই তো অফিসিয়ালি আমার জুনিয়র হয়ে যাবে। প্র্যাকটিসিং লাইসেন্সের জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করে কমিশনারের কাছ থেকে আমিই তা আনিয়ে দেব।

প্যানা, পচছিল মাছের ব্যাপারী সাপুইবাবুর কাছে তখন। একবেলা খাওয়া এবং হাত খরচ তিনশ টাকা। পাঁচশ টাকার লোভে গোপিনাথপুরে চলে এল। মায়না, পাঁচবছরে বেড়ে বেড়ে এখন ছশো টাকা হয়েছে।

কিন্তু বি.কম. পরীক্ষাতে বসা আর হয়নি।

নসু মোক্তারের নিজেরই কোন গরজ নেই সেই ব্যাপারে। মাঝে মাঝে, শুধু লোক-দেখাবার জন্যেই বলেন, সত্যিই তো! তোমার বি.কম. পরীক্ষাতে বসাই হচ্ছেনা। তবে তুমি এখন যে-কোন সি.এ.-র সমান। হাতের কাজই হচ্ছে আসল। বুঝলে না, পাকানো-কাগজ দিয়ে আর কি হয়? সেতো আলমারীর কোণেতেই পড়ে থাকে।

প্যানা, গোপিনাথপুরে আসাতে ; নসু মোক্তারের আয় বেড়ে গেছে বহুগুণ। পাড়াতে দশকাঠা জমি নিয়ে পেল্লায় বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলেছেন। হিন্দুস্থান মোটরের ল্যান্ড মাসটার কিনেছেন, তার উপরে গিন্নীর জন্যে একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড ফিয়াট মিলিসেন্টো।

দুই ছেলে, খেপু এবং খেনুও বিহারী ড্রাইভারের পাশে বসে স্কুলে যেতে আসতে গাড়ি চালানো শিখে ফেলেছে। এবার হয়ত তাদের জন্যেও আসবে গাড়ি।

নসুবাবুর রোজগার "মেহনতের" না যতটা, "হুজুরের নামে" তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। এ সত্য, হুজুরেরা এবং মক্কেলরাও মেনে নিয়েছেন। কেননা, নসুবাবুও গোপিনাথপুরের কিং-পিন। তাঁর সাহায্য ছাড়াও কারো চলে না। এই

সিচুয়েশানটা তিনিও পুরোপুরি একসপ্লয়েট করে গেছেন ও যাচ্ছেন দীর্ঘদিন হল। টাকার জন্যে উনি সাহেবদের "গু"ও খেতে পারেন।

এখানে আর যাঁরা পুরণো উকিল মোক্তার আছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইনকামট্যাক্স করেন না ; বোঝেনও না। আর যাঁরা সত্যিই আইন জানেন, তাঁদের হাঁড়ি চড়ে না। নব্য ভারতে এইটেই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাকাউন্ট্যান্সী জানেন না বলেও বিষয়টাকে কব্জা করতে পারেন না অনেকে, সবসময়ে।

অন্য কারো কাছে যে চলে যাবে প্যানা, তারও উপায় নেই। ইচ্ছেও নেই। অথচ এই কাজ ছাড়া, অন্য কোন কাজও শেখেনি ও।

দু'একজন বড় মক্কেল অবশ্য লোভ দেখায়। বলে, ছেড়ে চলে এসো আমার কাছে। আমার এতরকম ব্যবসা। সব কাজ তুমিই দেখবে। খাতা লেখা, ইনকামট্যাক্স সেলট্যাক্স সামলানো। যা পাচ্ছ তার দু'গুণ দেব, কোয়ার্টারও দেব।

তবুও সাহস পায় না প্যানা।

প্যানা যে বাঙালী। ওর রক্ত যাবে কোথায়? নতুন কোনো কিছু করতেই সাহসে কুলোয় না।

তাছাড়া এও ভাবে, কোনোদিন যদি বি.কম. পরীক্ষাটা পাশ করতে পারে, প্র্যাকটিসিং লাইসেন্সটা পেয়ে যায়, তবে, মাসে সে অনেকই হাজার টাকা রোজগার করতে পারে। আবার ভাবে, বেশি টাকা রোজগার করেই বা কি করবে? তার প্রয়োজন তো সামান্যই। মিথ্যে প্রয়োজন, মিথ্যেমিথ্যি বাড়াবার ইচ্ছা তার নেই।

তাছাড়া এও ঠিক যে, নসু মোক্তারকে ছেড়ে গেলে, কোয়ার্টার নিয়ে করবেটা কি? থাকবে কে সেখানে? একাই যদি থাকে, তো যেখানে আছে এই যথেষ্ট। জগমগিকে দেখতে তো পায়।

এই এত রকম সমস্যা দেখার সুযোগও নিয়মিত কোন একজন ব্যবসায়ীর কাছে পাবে না, ছেড়ে গেলে। সেরেস্তার নানারকম বইপত্র, ইনকামট্যাক্স-রিপোর্ট নিয়মিত পড়ার সুবিধা। প্রতিবছর যে ইনকামট্যাক্স, ওয়েলট্যাক্স, গিফট ট্যাক্স, ইত্যাদি আইনে রদবদল হয় ; সেই সব নখদর্পণে রাখতে পারবে না আর।

নসু মোক্তার আজকাল শুধু টাকাটাই পকেটে পোরেন। এক নম্বরের দু'নম্বরের। তার খাটনিটা পুরোই চাপিয়ে দিয়েছেন প্যানারই ঘাড়ে। যত ড্রাফটিং, রিটন্ সাবমিশন ; গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিল, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস, রিটার্ন-ফিলিং, ট্যাক্স-ক্যালকুলেশন, সবই।

আরও দু'জন আছেন সেরেস্তায়। যদিও তাঁরা ইন্ডিভিজুয়াল আর ফার্মের

রিটার্ন, চালান ফর্ম ভর্তি করা ; আর মক্কেলদের কাছ থেকে নির্লজ্জের মতন "জলপানি" চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। নসু মোক্তারের যোগ্য জুনিয়র।

একজন কাজ জানা জুনিয়র ছিলেন। নিশিকান্ত সমাদ্দার তিনি বছর ছয় হয়ে গেল, মালদাতে চলে গিয়ে নতুন চেম্বার খুলেছেন। খুবই ভাল পসার। তিনি চলে যাবার পরই নসু মোক্তার প্যানাকে ধরে-পাকড়ে আনেন।

একদিন দেখা হয়ে গেছিল নসু-মোক্তারের পুরনো মুহুরী, নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে, রবিবার সকালে গল্প করছিল ও। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন ইউ. ডি. সি.। নিশিকান্তবাবু নতুন ফিয়াট গাড়ি কিনেছেন। তা থেকে নেমে, আদর করে ওঁদের সকলকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে, চা-সিঙ্গারা-মিষ্টি খাওয়ালেন।

প্যানাকে বললেন, আপনার কথা শুনেছি অনেকেরই কাছে। মানে মানে ভেগে পড়ুন মহায়, নইলে নসু মোক্তার আপনার রক্ত খেয়ে নেবেন। তাঁর প্রিন্সেরা যেই বি. কম. পাশ করবে, দেখবেন তখন আপনার কি হাল হয়! আমিই না হয় টাকা দিচ্ছি। একবছরের মাইনে। বি. কম.টা পাশ করে নিয়ে, এখানেই নতুন পসার শুরু করুন। এখনও ত বি. কম.দের দিচ্ছে প্র্যাকটিস করতে। নয়ত, মালদা চলে আসুন। যে কাজ জানে, তার আবার কাজের অভাব হয় নাকি ? তার উপরে কাজ-জানা মানুষ যদি আপনার মতন সৎ হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। লোকে আপনার পেছনে দৌড়ে বেড়াবে। আরও একটা কথা বলি। কাজ যখন করবেন, তখন কাজটা মালিকের কাজ বলে ভাববেন না। মালিক যেই হন না কেন। কাজটাকে নিজের কাজ বলেই জানবেন। তবেই আরও এবং ভাল শিখতে পারবেন। নসু মোক্তার কাজ জানতেন। আজকাল কাজের চেয়ে টাকার উপর লোভ জন্মেছে বেশি। ওঁর পসার আর বেশিদিন নেই। ছেলেরাও কাজ না শিখলে, এমনি এমনি আর কেউ মুখ দেখে কাজ দেবে না।

টাকা টাকা করলে, টাকা আসেনা। কাজ ভাল করে করলে, টাকা দৌড়ে এসে পকেটে ঢুকবে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিশিকান্তবাবু বললেন, হ্যাঃ। এমনি এমনি কি আর একটা জাত উপরে উঠে আসে মহায়। মালিক, কর্মচারী, বাবা, ছেলে, খুড়ো ভাইপো, মামা ভাগ্নে প্রত্যেকে সমান কাজ করে মাড়োয়ারীরা। তবে তাদের মধ্যে যোগ্যতা হয়ত সমান থাকে না সকলের কিন্তু প্রত্যেক মাড়োয়ারী পরিবারে এবং তাদের প্রত্যেক প্রজন্মেই একজনকে নেতা বলে মেনে নেন ওঁরা। তাই, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প সবই এগোয়। বাঙালীদের মতন নয়। পাঁচপয়সার বাতাসা বা বিড়ি

বাঁধার বিজ্রনেস, তাতেই সবাই কাপ্তান, সবাই মাস্তান ; কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। তাছাড়া বাঙালীরা খাটে না। দুটো পয়সা হয়ে গেলে তো একেবারেই খাটে না। কী আর বলব দুঃখের কথা, বলতে দুঃখও হয়; কেউ যদি বা একটু উপরে উঠল, অমনি কাছা ধরে তাকে টেনে নামাবার ষড়যন্ত্র চলল। সবচেয়ে কাছের মানুষ যারা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই শত্রু হয়ে গেল। এমন আশ্চর্য পরশ্রীকাতর, শ্রমবিমুখ ; ঈর্ষাপরায়ণ জাত আর দুটি নেই মহায়।

প্যানা ভাবছিল, মানুষ একটু সফল হলেই বড় বেশি জ্ঞান দেয়। অন্যান্য দোষেরই মতন এও বাঙালীদের আরেকটা দোষ।

তারপর নিশিকান্তবাবু বললেন, চলুন, ওঠা যাক। আমার বয়স হল পঁয়তাল্লিশ। পনেরো বছর থেকে খাতা লেখার কাজ করছি। মিথ্যে বলব না, মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে অনেকই শিখেছি মহায়। আজকে মাড়োয়ারীরা যে পশ্চিমবাংলার মালিক হয়ে গেছে, তার জন্যে তাদের কৃতিত্ব যতখানি, আমাদের অকৃতিত্বও ঠিক ততখানিই। একথা যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা হয় মাড়োয়ারী প্রজাতিকে কাছ থেকে জানেননি, নয়ত তাঁদের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত নন। অবশ্য তাঁদের যে সবই গুণ এমন কথা আমি বলছি না। নয়ত বলব যে ; সেই সব আত্মগর্বে গর্বিত বাঙালীরা কখনও আয়নার সামনে দাঁড়াননি।

নিশিকান্তবাবু তাঁর নতুন কচিকলাপাতা-রঙা ফিয়াটে চড়ে চলে গেলেন।

কান ভন ভন করছিল প্যানার। যাঁরাই সাকসেসফুল , তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বেশি কথা বলেন। দু' একজন হয়ত থাকেন ব্যতিক্রম।

আই. এ. সি. সাহেব আসার পর হাকিমেরা এবং নসু মোক্তার তাঁকে নিয়ে সার্কিট হাউসে গেলেন। স্টেনোর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে একটি সস্তা হোটেলে। তবে চাপরাশী সারাদিন সাহেবের সঙ্গেই থাকবে। রাতে গিয়ে শোবে অন্যত্র।

নসুবাবু স্টেশান থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, পূর্ণ, তুমি সাইকেলে এখুনি রওনা হয়ে যাও পদা বাংলোর দিকে। ঘাঁতি থেকে ইন্সপেকটরবাবুরা পৌঁছে যাবেন সব রসদ আর রান্নার ঠাকুর-চাকরদের নিয়ে। তুমি গিয়ে তাঁদের সাহায্য করবে। তোমাদের দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত ওখানেই আছে। ওঁরা ঘাঁতি হয়ে যাবেন গাড়িতে। ঘাঁতিতে চা খেয়ে সন্ধের মুখে মুখে পৌঁছবেন। সাহেবদের ড্রিঙ্কস-এর সঙ্গে খাওয়ার জন্যে কিছু কাবাব জাতীয় জিনিস এবং পেঁয়াজী-টেঁয়াজী রেডি করে রাখতে বোলো। ওরা পৌঁছলেই যেন গরম গরম ভেজে দেওয়া হয়।

আপনি যাবেন না?

প্যানা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আহা। যাব বইকি। কিন্তু আমিও তো অতিথিরই মতন যাব। তোমরাই হচ্ছ রিয়্যাল হোস্ট। আমরা সকলেই গেস্ট।

ও।

প্যানা বলল।

ইনসপেক্টরবাবুকে বোলো, যা বলার। তুমি তো রাস্তা চেনোই। রওয়ানা হয়ে যাও। চমৎকার রাস্তা। চমৎকার দৃশ্য।

প্যানা, সামান্যক্ষণ নসু মোক্তারের মুখে চুপ করে চেয়ে থেকে বলল, ঠিক

আছে।

সাইকেলে উঠলেই, পূর্ণকে ভাবনাতে পায়, বিশেষ করে ফাঁকা রাস্তায়। তার মন তখন বুড়ির চুলের মতন ফুরফুরে হয়ে যায়; শিমুল তুলোর মত ওড়ে; দিকে দিকে।

মাঝে মাঝে খুবই রাগ হয়ে যায় নসু মোক্তারের ওপরে। এটা ঠিক, মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের মুনিমেরা বা মুহুরীরা কিছুতেই "না" করেন না। তবে তাঁদের মাইনেও অনেক ভাল। তাঁদের ছেলেদের পড়াশুনো, মেয়েদের বিয়ে, এসব মালিকেরাই দেখেন। তাই মনপ্রাণ ঢেলে তাঁরা কাজ করতে পারেন। তাছাড়া, লক্ষ্মীর সাধনাই তাঁদের আগের প্রজন্ম অবধি একমাত্র সাধনা ছিল। নতুন প্রজন্ম অবশ্য সরস্বতীর সাধনাও করছেন পুরোদমে। তাঁরা যাই করেন, তাই ভাল করে করেন।

পূর্ণর একটি ক্যাসেট-প্লেয়ার আছে। কখনও সময় করতে পারলে, সে গান শোনে। রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ ; কিছু ক্ল্যাসিক্যাল।

জগমগি তখন তার ঘর ছেড়ে লঘুপায়ে এসে দাওয়াতে দাঁড়িয়ে বলে, আঁউ ম্যায়? পূরণদাদা?

আও, আও, বহিন। মেরী খুশনসিবী।

জগমগিও দারুণ গান গায়। ওর ছোট হারমনিয়ম বাজিয়ে। পূর্ণর একটি ছোট তানপুরা আছে। রাধানগরে কিনেছিল। তার সঙ্গে, মাঝে মাঝে রেওয়াজ করে দুজনে।

হাজারীবাগের ছেলে বলে, হিন্দীটা মোটামুটি বলতে পারে পূর্ণ।

জগমগি পাটনার মেয়ে। তার মা পাটনার এক সাধারণ বাঈজী ছিল। বাস ছিল ওদের বাইজী মহল্লাতে। পনের বছর বয়সে জগমগি এক ছোকরা সারেঙ্গীওয়ালার সঙ্গে ভেগে এসেছিল। সেই মুনাব্বর ছোকরার, জগমগির নথ-খসানোতে যতটা উৎসাহ ছিল, ততটা উৎসাহ ছিল না জগমগির গানে, বা নিজের সাংগীতিক উৎকর্ষে। সারেঙ্গীর দৌড়ও ছিল তার সেরকমই। সারেঙ্গী ঠিকমত বাঁধতে পর্যন্ত পারত না।

জগমগির মা, বাঈজী মুন্নী বাঈ এবং তাঁর পেয়ারা ও মুখ্য সারেঙ্গীওয়ালা আতা খাঁ বলতেন, ও ছোকরার দ্বারা আর যাই হোক, গান-বাজনা হবে না। ও গান গাইলে, গিদ্দরও কোকিল হতে পারে।

কিন্তু জগমগি তার বাজনাতে মজেনি। সারেঙ্গী নয়, সে জগমগিকেই ভাল বাজাতে পারত বলেই ভাল লেগেছিল। এবং হয়ত সেই জন্যেই জগমগিকে প্রাণভরে বাজিয়ে, সাধ মিটলে ; মুনাব্বর একদিন দারভাঙ্গার বাড়ি থেকে না,

বলে কয়ে শেষরাতে উধাও হয়ে গেছিল।

সব বাজনার প্রতি মোহ কারোই চিরদিন থাকে না।

ঐ রূপ নিয়ে, ঐ অল্প বয়সে অচেনা জায়গাতে জগমগি চিরদিনের মতনই ভেসে যেতে পারত। তার স্থান হত হয়ত দিল্লি, বম্বে, লক্ষ্ণৌর কোন শুধুই বাজানেয়ালি তবায়েফদের মহল্লাতে। তারপর, কোনো বড় শহরের লাল-বাতি এলাকাতে। ঠিক সেই সময়েই নাথু ভোগতা, অসমবয়সী মানুষটিই তাকে "উদ্ধার" করে নিয়ে চলে আসে। জগমগির সঙ্গে আলাপ হবার একদিন আগেই তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছিল গোপিনাথপুর থেকে। ভাল কুস্তীগীর ছিল নাথু এবং লেঠেলও ছিল।

গোপিনাথপুর জায়গাটা বিহারের লাগোয়া। সেখানে নাথু ভোগতার চাচেরা দাদা তখন থাকতেন। সেই সূত্রে তারই মুনাবিদায়, চাকরীটা হয়ে যায়।

তবে, সংসারে পতিতকে বা পতনোন্মুখকে নিজ স্বার্থহীন উৎসাহে কম মানুষই উদ্ধার করে। নাথুর বউ বুধিয়া পালিয়ে গেছিল, সারেঙ্গীওয়ালা মুনাব্বর ভাগবার দিন সাতেক আগে। ভেগেছিল সে, মুনাব্বরেই সঙ্গে। সেই ক্ষোভ ও দুঃখে গনগন করছিল নাথু তখন। তাই জগমগিকে 'উদ্ধার' করার পেছনে জগমগির স্বার্থ বা নিজস্বহত্ব যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেকই বেশি ছিল নিজের জ্বালাতে প্রলেপ দেবার, প্রশমিত করার। প্রতিশোধ স্পৃহাও হয়ত ছিল কিছুটা। নইলে, নাথুর নিজের মতন আর কেউই জানত না যে, সে জগমগিকে চিরদিন রাখতে পারবে না। নাথু যে নিমরদ, তা নাথুর চেয়ে ভাল আর কেউই জানত না। জগমগি তার আশ্রয় পাবার পরই নতুন কারো সঙ্গে ভেগে যেতে পারত কিন্তু সেই রূপকথার ভণ্ড ব্যাধ যেমন পাখিদের কাছে সন্ন্যাসী সেজে বসে থাকার পর শিকার করাই চিরদিনের মতন ছেড়ে দিয়েছিল ; মন-বিবর্জিত শরীরকে বড় অল্পবয়সে প্রশ্রয় দিয়ে জগমগি, শরীর ব্যাপারটার সসীমতা সম্বন্ধেও কিছু বুঝেছিল। নাথু যে নিমরদ, তা সে প্রথম সঙ্গমের সময়েই বুঝেছিল। বুঝে মনে মনে হেসেছিল। হেসেছিল, খুদার কারসাজি দেখে।

এদিকে যখন ওরা এসে হরিনাথপুরে পৌঁছল, তারই একমাসের মধ্যে পূর্ণও এসে উঠল তার উল্টোদিকের ঘরে।

একটি হঠাৎ অল্পরাত, জগমগির বুকের মধ্যে যতটুকু অস্থিরতা ছিল, তাকে দূর করে, কড়িমার মহিমার সঙ্গে স্থিতি দিল। চৈত্রর পূর্ণিমা ছিল। আলোতে ছায়াতে, হাওয়াতে গন্ধে মারামারী চলছিল যখন চারদিকে, ঠিক তখনই সবে-আসা পূর্ণ, তার ঘরে, দাওয়াতে বসে, তানপুরা ছেড়ে বাহারেতে গান ধরেছিল।

জগমণি দৌড়ে এসছিল ঘরের ভিতর থেকে। তারপর প্রায় অপরিচিত পূর্ণর কাছে নিজের ছোট হারমনিয়মটি নিয়ে গিয়ে বসেছিল। বসেতনি, যেন সমর্পণ করেছিল নিজেকে।

"গান" এমনই জিনিস যে, সে "মান" মানে না। দুপক্ষের মানকেই দু পক্ষ ধুলোতে লুটিয়ে অদৃশ্য এক বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধেছিল দুজনে দুজনকে।

অথচ মুখে একটি কথা হয়নি। শুধু চোখে হয়েছিল। সেই প্রথম দিনে। নাথু ভোগতা নিশ্চিত হয়েছিল। খুশি হয়েছিল। ও জগমণিকে যা দিতে পারেনি, জানত যে পারবেও না কখনও; তার বদলে পূর্ণ তাকে অন্য এক স্বর্গীয় দান দিয়েছিল।

শরীরের মধ্যেও স্বর্গ আছে, তবে অনধিকারীর হাতে পড়লে, তা নরক হয়ে ওঠে। সে কথা, জগমণি জানত।

ওরা যখন গান গাইত দুজনে, তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকত নাথু ; যখন সে বাড়িতে থাকত।

বনবিহারীবাবু বা গোপিনাথবাবুর পরিবারে গান ব্যাপারটা পোলাউ-মাংস অথবা কার্পেটের মতনই বাহুল্য বলে গণ্য ছিল। ওঁদের গান-বাজনাতে না ছিল উৎসাহ; না কোনো বিদ্বেষ। দিনের বেলা হলে, কখনও কখনও বনবিহারী বাবুর ছেলেটি এসে জগমণির হারমনিয়মের "বেলোর" ফুটোতে আঙুল ঢুকিয়ে দিত। একবার পূর্ণর তানপুরার তারও ছিঁড়ে দিয়েছিল। একবারই মাত্র। এছাড়া কোনো দুর্যোগ ঘটেনি। গানের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দুজনে দুজনের অজান্তে যে দুজনের খুবই কাছাকাছি চলে এসেছিল, তা ওরা নিজেরাই বুঝতে পারেনি।

নাথুর বউ বুধিয়াকে মুসলমান মুনাব্বর নারেঙ্গীওয়ালা নিজে ভাগবার সময়ে যে, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তাতে হিন্দুদের মধ্যে যে ক্ষোভ জমেছিল ; জগমণিকে নিয়ে, নাথুর হরিনাথপুরে চলে যাওয়াতে সেই ক্ষোভ অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল।

"রামজী যা করেন মঙ্গলের জন্যেই।"

নাথুদাদা বলেছিল।

প্রথম কয়েকদিন কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। তারপর দু-এক দিন তার চেষ্টা চলেছিল। সম্পর্কটা, জগমণির ভাষাতে, 'জমা নেহিথা'। চেষ্টা নাথুই চালিয়েছিল, নতুন কুঁয়োতে জল উঠলেও উঠতে পারে ভেবে। কিন্তু ওঠেনি।

কিন্তু বাহ্যত সম্পর্কটা রয়েই গেছে। লোক দেখানো। আবার লোক দেখানো নয়ও।

জগমগি একবার অল্পবয়সে ভেসে গেছিল বলেই, নোঙ্গরের মূল্যটা অনেকের চেয়ে বেশি বুঝত।

নাথুদা মানুষটা ছিল অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। তুলসীদাসের ভক্ত। যতটুকু উদ্বৃত্ত সময় পেত, তুলসীদাস পড়ত। জগমগিকে নিয়ে মথুরা বৃন্দাবন পুরী বৈদ্যনাথ ধাম সব ঘুরে এসেছে গত শীতে।

এদিকে, জগমগিও মুনাব্বরের সঙ্গে যখন ছিল তখন নিয়ম করে নামাজ পড়ত। এখন তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালে।

নাথুদা বলেছে "ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম, সবকা সুম্মতি দে ভগয়ান।"

মাঝে মাঝে আবার নামাজও পড়ে।

জগমগি, নাথুর জন্যে রান্না করত। ডিউটি সেরে ঘরে এলে, তার পা টিপে দিত। তাদের দাম্পত্যে বাইরে থেকে কোন ফাঁক দেখা যেত না। কারও কোন অভিযোগ আছে বলেও মনে হত না একে অন্যের প্রতি।

প্রথম দিনগুলোতে জগমগিও কোন অভাব বোধ করেনি। বাঈজী বাড়ির শরীর-সর্বস্ব আবহাওয়া থেকে এসে, এমন সাত্ত্বিক মানুষের সংসর্গ করতে পেরে, সে সত্যি সত্যিই খুশি হয়েছিল খুবই। বিশেষ করে মুনাব্বর খাঁ, সারেঙ্গীওয়ালার শরীর-সর্বস্ব কামড়াকামড়ি-করা ভালবাসার পরে। লোকটা গান-বাজনা সত্যিকারের ভালবাসলেও বা তার ঐ অস্বাভাবিক ক্ষিধেকে গুণীজনের ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া যেত।

এখন জগমগির বয়স হয়েছে বাইশ। পূর্ণর প্রায় সমবয়সী ও। পূর্ণর থেকে সামান্যই ছোট।

এই চার-ঘর এক-উঠোনের বাড়িতে একটি অমলতাস ফুলের গাছেরই মত জগমগি, পূর্ণর শিমুলের মতন ঋজু শরীর, তার সঙ্গীত-প্রীতি, তার কঠোর পরিশ্রম করার পুরুষালি ক্ষমতা, তার শিকড়হীনতা এবং একটি দরদী, নরম, সহমর্মিতায় টইটম্বুর, শালীন, অসাধারণ ভদ্র মানসিকতা জগমগিকে তার দিকে তীব্রভাবে আকর্ষিত করেছিল।

জগমগি ভাবত। সত্যি! সংসারে কত রকমের ঘটনাই না ঘটে!

কোন পটভূমির, কোন মানসিকতার, কোন অনুষঙ্গর কোন মানুষ যে, কোথায় ভেসে এসে কার সঙ্গে কখন জোড় বাঁধে, সে বিধাতাই জানেন ; এই সংসারে, ভাবত জগমগি, একা ঘরে বসে বসে। কখনও কখনও, সারাদিন মাথার কাজ-করা, দীর্ঘ, ঘুমহীন কাম-জরজর রাতে, টগবগে যৌবনের সমস্ত রকম কষ্টে ক্লিষ্ট হয়ে, মা বাবার বা অন্যকারোই স্নেহপ্রীতি থেকে, প্রথম যৌবন থেকেই পুরোপুরি

বঞ্চিত হওয়া পূর্ণ ভাবত যে, কার জীবন যে, কাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা সত্যিই ঈশ্বরই জানেন।

পূর্ণ ছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান।

সাপেরা যেমন বনপথে জোড় লাগে, তেমনই জোড় লেগে; বাবার বয়সী নাথুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভেসে এসেছিল জগমগি। অথচ এই মুহূর্তে বুঝতে পারে যে, তার সেদিনের জোড় তার অজ্ঞাতসারেই বিজোড় হয়ে গেছে।

তবে একটা কথা ভেবে ও আশ্বস্ত বোধ করে যে, নাথুকে ও ছেড়ে চলে গেলে নাথুর কোন কষ্টই হবে না। রামজী আর রামচরিতমানস এবং তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ালেই নাথু তার জীবনের ইপ্সিত ধন খুঁজে পাবে।

নাথু সবসময়েই বলত, খুশ রহো তু। মেরী আওরৎ, মেরী ভৈরবী ; তু খুশ রহো। যেইসে ভি হো। মুঝে কুছ না চাহিয়ে তুমসে।

মানুষটাকে কাছ থেকে দেখে, যবনী জগমগি ; হিন্দুদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল।

পূর্ণকে, গত তিনবছর ধরে খুব কাছ থেকে দেখার পরে, জানার পরে, তার একাকিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করার পরে পূর্ণর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে জগমগি। অথচ এই আকর্ষণের কোন পরিণতি নেই। ও জানত, ভাবত; যে নেই। পূর্ণ ওকিল সাহাব। আর জগমগি একজন খারাপ মেয়ে। বে-খানদান।

অবশ্য এটা ঠিক যে, তার নামের গর্বও যেমন ছিল না, দুর্নামের কলঙ্কও ছিল না।

তার শারীরিক সৌন্দর্যর জন্যে বহু পুরুষই তাকে শরীরে কামনা করত, নিত্যদিনই ; পুরুষের মন ও শরীরের উদগ্র কামনার প্রকৃতি বুঝে ও জেনেছিল যে, শুধুই শরীরের সুখ কোনো নারী তো বটেই, কোনো পুরুষকেও কোনদিনও পূর্ণতা দিতে পারে না। সেই পূর্ণ, প্রকৃত-পূর্ণতাই জগমগির প্রার্থিত ছিল। যে পূর্ণতার কথা অনেকেরই অজানা।

এই পূর্ণতার আকাঙক্ষার জন্যে, এই গভীর বোধের জন্যে ; বি.এ. এম.এ. পাশ করতে হয় না। কিছু শিক্ষা, কিছু বোধ, সব মানুষই তার ভিতরে ভিতরে গড়ে নিয়ে জীবনের পথে এগোয়। জীবনের সব শিক্ষাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনদিনও দিতে পারে না। যে, সেই পরম শিক্ষাতে শিক্ষিত হতে চায়, সে আপনা থেকেই সেই শিক্ষার চারাগাছকে সযত্নে বর্দ্ধিত করে নিতে পারে অন্তরের গভীরে। সেই শিক্ষার স্বরূপ বাইরে থেকে বোঝা যায় না কোনদিনও। সেই স্নাতকের কনভোকেশন হয়না, কালো গাউন আর টুপি পরে। কিন্তু সেই শিক্ষা

সম্পূর্ণ হলে, তার শিকড়, পিপ্পল গাছের শিকড়েরই মতো বহু গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়। নিজেরই অজান্তে।

পূর্ণও ভেবেছে, অনেকই দিনরাতের একাকী মুহূর্তে যে ; জগমগি তাকে চাইবে কেন? কি আছে তার? জগমগি যদি নাথুদাকে কখনও ছাড়তেই চায়, তার জন্যেত গোপীনাথপুরের আচ্ছা আচ্ছা ব্যবসায়ীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। রূপবান, বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী। কোন মেয়ে না, ক্ষমতা চায়? বিত্ত চায়? কত প্রলোভন কতরকম বিরক্তিতেই যে, দিনরাত উত্যক্ত হতে হয় জগমগিকে, তা পূর্ণ ভাল করেই জানে। অবাক হয়ে যায় তাই জগমগির ঠাণ্ডা মাথা এবং নাথুদার প্রতি বিশ্বস্ততার অবিশ্বাস্য গুণে। জগমগি মানুষী নয়, দেবী।

ভাবে, পূর্ণ।

ওদের সন্তান হয়নি কেন? কার দোষে?

জিজ্ঞেস করার মতন স্থূলতা ছিল না পূর্ণর। অনুমান করার চেষ্টা যে করত না তা নয়। চেষ্টা করত। তারপর, উইশফুল থিংকিং-এ ভেবে খুশি হত যে, এ নিশ্চয়ই নাথুদারই দোষ। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে এরকমই হয়। শ্রীরাম আর তুলসীদাসের প্রতি অশেষ মনোযোগ হয়ত নাথুদাকে নির্বীর্য করে দিয়েছে। যে-কোন ব্যাপারেই আধিক্য ঘটলে যে-কোন মানুষই শারীরিক এবং মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারেই।

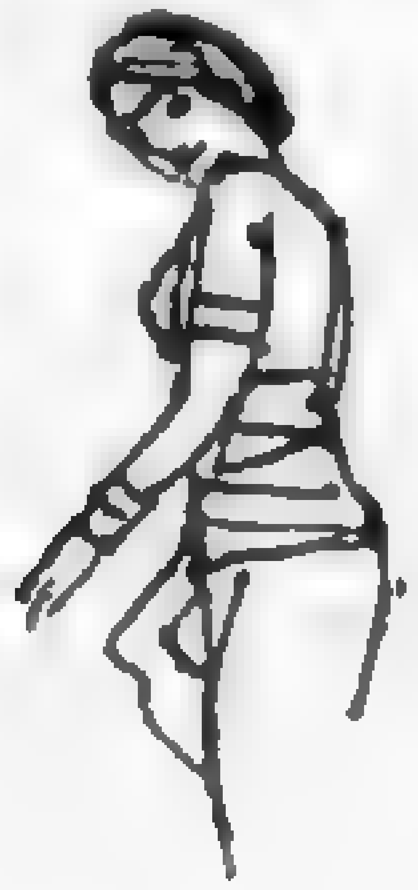

এত কথা পূর্ণ ভাবছিল সাইকেল চালাতে চালাতে। দুটি চোখ ছিল শিশির-ভেজা পায়ে চলা পথেরই উপরে। ডানদিকে ময়ূরাক্ষীর একটি সরু শাখা নদীর সোঁতা। নলবন। বাঁ দিকে হরজাই জঙ্গল। শিমুল, জংলী আম, শিরিষ, সোনাঝুরি, তেঁতুল, চালতা, বুনো কুল, কদম। বেশ ঘন বন। এ নাকি রাঠোড়দের জমিদারীর বনের অংশবিশেষ। রাঠোড় মানে, রাজস্থানের রাঠোড়। যোদ্ধার জাত। সরকার নিয়ে নিয়েছেন কিনা জানা নেই, তবে এই বন এখনও প্রায় নিশ্ছিদ্র। নানা জাতের বড় বড় সাপের আড্ডা এখানে। তাই কম লোকেই এ বনে ঢোকে।

জনশ্রুতি আছে যে, এর গভীরে রাঠোড়দের মা ভবানীর মন্দির আছে। তা নাকি পাহারা দেয় ঐ সাপেরাই। সত্যি কি মিথ্যা তা বলতে পারবে না পূর্ণ। ঐ বনের পাশের পথ বেয়ে ও যে বছরে একবার সাইকেলে করেও যায় খাঁতিতে তা শুনেও অনেকে আঁৎকে ওঠে। বনে নাকি, বড় বড় শঙ্খচূড় আছে। তারা তাড়া করে এসে কপালে বা বুকে ছোবল মারে। দড়ি বাঁধার অবকাশও দেয় না কাউকেই।

পূর্ণ ভাবছিল, হয়ত এই কারণেই গত তিন বছরে, যাতায়াতের পথে ও একজনও মানুষজন দেখেনি।

আরও এগিয়ে গেলে যেখানে বনশেষে জনপদ আছে, সেখানে নদীর ডান পাড়ে চাষাবাদ করতে দেখেছে মানুষজনকে। বলদের লেজ মুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের জিভ আর টাগরা দিয়ে বের করা নানারকম আওয়াজ। দুপুরে, বাবা-দাদার জন্যে গামছাতে জড়িয়ে খাবার নিয়ে আসা শিশুকন্যার চিকন ডাক। এসব শুনেছে, দেখেছে। তবে পথেই, বা বাঁদিকের বনে কাউকেই দেখেনি।

পূর্ণ প্রায়ই ভাবে যে, জগমগিকে নিয়ে ও একবার এই বনে হারিয়ে যায়। ওরা গান গাইবে দুজনে পূর্ণিমা রাতে। কেউ থাকবে না ধারে কাছে, শুধু সাপেরা ছাড়া। জঙ্গলে ওর ভয় নেই, ঔৎসুক্য আছে। হাজারীবাগে ওরা যখন বড় হয়েছে তখন শহরের মধ্যেই জঙ্গল ছিল, আর জঙ্গলের কথা ছেড়েই দিল।

আসলে, পথটা এবারে এতই সরু হয়ে এসেছে এবং নানা রকম কাঁটা আর ঝরা পাতায় ছেয়ে রয়েছে যে; তার উপর দিয়ে অন্ধর মতন সাইকেল চালিয়ে যাওয়াটাও মূর্খামি হবে। টায়ার দুটোও খুবই পুরনো হয়ে গেছে। ক্ষয়ে গেছে। অনেকবারই বলেছে পূর্ণ, নসু মোক্তারকে। কিন্তু হচ্ছে হচ্ছে, হবে হবে করে ওঁর সময়ই হয়নি। অথচ নিজের দু দুটি গাড়ির সার্ভিস মাসের ঠিক ঠাক দিনে করাতে কোন্ ভুল হয় না নতুন বড়লোক নসুবাবুর।

সাইকেলের স্পিডটা কমিয়ে এনে ভাবছিল, নেমে পড়বে এবারে। স্পিড কমাতেই, ভাবনাও থেমে গেল এবং সাইকেলের ব্রেক এ হাত দিয়ে চাপ দিয়ে যেই নামতে যাবে, ঠিক তখনই সামনের টায়ারের নীচে কিছু একটা ঢুকলো। হঠাৎই দু হাতে ধরা হ্যান্ডেলটা ভারী হয়ে এলো এবং ফিসস-স-স-স করে একটা শব্দ।

গেল!

এখনও মাইল ছয়েক পথ বাকি এবং পথের মধ্যে অনেকটা আবার এমনই যে, সাইকেল হাঁটিয়ে বা কাঁধে করেই নিয়ে যেতে হবে। টায়ার যদি পাংচার নাও হত।

মাঝে মাঝে সত্যিই ভীষণ রাগ হয়ে যায় পূর্ণর এই নসু মোক্তারের উপরে মানুষটা তাকে সবদিক দিয়েই নষ্ট করে দিল। ওকে আর মানুষই থাকতে দেবেনা লোকটা।

সাইকেলটাকে একটা শিমুলের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে সেই শিমুলেরই একটা শিকড়ের উপরে বসল ও। বুদ্ধির গোড়াতে ধোঁয়া দিতে।

মানুষ যখন চলে, হেঁটেই চলুক, বা সাইকেলেই চলুক বা ট্রেনেই চলুক; তার ভাবনাও চলে তার সঙ্গে সঙ্গে। যখন থামে, তখনও তাবলে তার ভাবনার চলা বন্ধ হয় না। কিন্তু সেই চলার রকমটা অন্য। সে চলা, বড় শান্ত চলা। শীতের নদীর চাল এর মতন।

হিসেব করে দেখল পূর্ণ, মনে মনে যে, হেঁটে, সাইকেল ঠেলে নিয়ে গিয়ে ডাক-বাংলোতে পৌঁছতে পৌঁছতে তার হয়ত রাতই হয়ে যাবে। সঙ্গে টর্চও নিয়ে আসেনি। আসা উচিত ছিল। একবার ভাবল, ফিরেই যায়। কোন ইনসপেকটরবাবু

যাবেন ঘাঁতি থেকে, তা ও জানেনা। আশাকরি রান্না টান্না করিয়েই রাখবেন তিনি। এখনই পেট চুঁই-চুঁই করছে। শেষ বিকেলে খিদের রকমটা কেমন হবে তা পেটই জানে। কোন ইনসপেক্টর আসবেন তাওত জানেনা। চাটুজ্যের সঙ্গে বনেনা ওর। হাব ভাব, বোলচাল এমনই যেন, হাকিম হয়েই গেছে। পাশ করে, কত জনে, কত বছর বসে রয়েছে!

পূর্ণর পেটটাও মহা ত্যাঁদোড় আছে। যখন ভিয়েন বসানো থাকে, হাতের কাছে সব খাবার-দাবার মজুদ থাকে তখন তার মোটেই খিদে পায়না। আর যখন খাদ্যদ্রব্য ধারে কাছে নেই, তখনই যত খিদে এসে তাকে জ্বালায়।

শিমুলের শিকড়ে বসে, চলা থামিয়ে যেই থিতু হয়েছে, অমনি তার পরিবেশ, অনুষঙ্গ, সোঁতার বুকের পুরনো দিনের বিধবার মতন বিবাগী ভাবটি; যেন তার বুকের মধ্যে উঠে এল কার্তিকের রোদ-ওঠা সকালের, প্রায় মরে-যাওয়া শিশিরের, শ্যাওড়া আর শিমুল আর নলবনের জংলী-জংলী গন্ধ সমেত। ছেলেবেলার হাজারীবাগের ছাড়োয়া ড্যামের কথা মনে পড়ে গেল। পথটা অনেকটা এমনই ছিল। তবে গাছ গাছালির রকম ভিন্ন। মাটির রঙ লাল। এই গাদন ডিভিশনের এলাকার চেহারা ছবি সব অন্যরকম। অন্য কোন জায়গার সঙ্গেই এর তুলনা হয়না।

সকালের হিমেল ভাবটাও ওর বুকের মধ্যে উঠে এল, শিশু যেমন পিসী বা মাসীর কোলে ওঠে, ধীরে-সুস্থে। উঠেই, যেন শিশুরই মতন ; গলা জড়িয়ে ধরল।

ভারী ভাল লাগতে লাগল পূর্ণর। এখানে এখন যদি জগমগি থাকত তার পাশে, তবে পূর্ণ তাকে বলত; কুকুভ বিলাওল বা যোগিয়া রাগে আলাপ করতে। না না, যোগিয়াও নয়, বলত দেশকার বা বিভাস এ। না, না। তান-বিস্তার নয়। শুধুই আলাপ। ধস্তাধস্তি বা কুস্তীরও আলাদা দাম আছে অবশ্যই কিন্তু আলাপ হচ্ছে গিয়ে আলতো চুমু। তার পরশ, তার রেশই আলাদা। দু চোখের পাতায় চুমু।

এ কথা মনে হয়েই, একা একাই হেসে ফেলল পূর্ণ। এ পর্যন্ত তার পোষা কুকুর বিটলুর মাথাতে ছাড়া, চুমু আর কোন জীবন্তপ্রাণীর শরীরের কোন অংশেই খায়নি ও। ভাবল, ওর কল্পনা শক্তি অসীম। আধুনিক কবিতা লিখলেও লিখতে পারত।

অবাক হয়ে যায় পূর্ণ, যবনী জগমগি কি করে নাথুদার ঘরে থেকে এই চার ঘর এক উঠোনের মধ্যে থেকেও, সারেঙ্গী ছাড়া, তবলা ছাড়া, শুধু একটি ছোট হারমনিয়াম নিয়েই তার সংগীত প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখল এতদিন। ও রক্তে গান

নিয়ে এসেছিল। ওর বুকের মধ্যে, ধমনীতে গান বয়ে আসছিল অনেক জন্ম ধরে। নইলে পূর্ণর ভাঙ্গা ঘরে খালি গলায় হাতে তাল দিয়ে ও অমন করে সব রাগ রাগিনীকে, বেদেনী যেমন বিভিন্ন জাতের সাপ নাচায়; তেমন করে নাচায় কি করে।

পূর্ণ নিজেও, নিশ্চয়ই কোন সংগীতজ্ঞ বা রসিক ছিল গত জন্মে। হয়ত, বড় দাদুর এবং বাবার কাছ থেকেই এই গুণগ্রাহীতা, সংগীত-প্রেম; মানব-প্রেম পেয়েছে। তার কাকারা শুধু জমিদারী দেখে, আয়াস করে, শিকার করে আর তাস পিটেই জীবন কাটিয়ে গেলেন। গানবাজনাতে কোনই উৎসাহ ছিল না ওঁদের। অন্য কোন সুকুমারবৃত্তিতেও নয়। তবে রক্ষিতা-টক্ষিতা ছিল বলে কানাঘুষোতে শুনেছে। জীবন যে একটা বৃহত্তর ব্যাপার, একটা মস্ত ব্যাপার, জীবন মানে যে, অনেক কিছুর সুষম সংমিশ্রণ; এসব ত ওঁরা মোটে জানলেনই না।

ওঁদের সঙ্গে কোনই মিল ছিলনা পূর্ণর।

জগমগি একটা গান প্রায়ই গায়, পূর্ণকেই শোনাবার জন্যে; বাঙলা গান। পাটনাতে বাঈজীরা নাকি অনেক বাঙলা গানও গাইত। বাঙালী রহিসদের সুখী করার জন্যে। গানটা শুনে মোহিত হয়ে গেছে, যায় পূর্ণ; যতবারই শোনে। হাম্বিরে বাঁধা। গভীর রাতের রাগ গায় ও গভীর রাতে। পূর্ণর অথবা নাথুদার ঘরের বারান্দাতে বসে। নিজে হাতেই ছোট হারমনিয়ামটা বাজিয়ে।

ওটা একটা কাওয়ালি পর্যায়ের গান—কলকাতার মেজ্রি বাঈজী গাইতেন নাকি আগে ঃ —

"তারে ভালবেসে কত পাই যাতনা।
মনেরে বুঝাইয়া রাখি আঁখি মানে না।
মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে নাহিক পারি,
আঁখি যে তার পোষা পাখি, সে প্রাণ জানে না"

এই গানটা গাইবার পরই এমনিতে হাসিখুশি, সদাই নিজের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ডগমগ-করা জগমগি যেন হঠাৎই কেমন বিষন্ন হয়ে যেত। কালো হয়ে যেত মুখটি। ওর মনের কথা পূর্ণ যেন বুঝত, আবার বুঝতও না।

কতক্ষণ ঐ পরিবেশে, ঐ অনুষঙ্গে, কার্তিকের ঐ সকালের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে বসে থাকল পূর্ণ ; সেই শিমুলের শিকড়ে, তার খেয়াল রইল না।

ওর মধ্যে একটা খেয়ালী যে আছে, যে, বে-খেয়ালে অনেক কিছুই করে তা ও জানে। জগমগি মেয়েটা তার বুকের ভিতরে পাখির নরম কোমল ছানার মতন যত্নে লুকিয়ে-রাখা সেই সত্তাটিতে। তার মনের কোমল আঙুল বোলায়। দানা-

পানি দেয়, জল খাওয়ায়; সলতে ভিজিয়ে। কী করে যে, সেই পাখির ছানাটার কথা জানতে পেল জগমগি; তা কে জানে। কিন্তু এটাও ঠিক, সেই পাখির ছানাটা শুধু জগমগির কথাই বোঝে, তার গলার স্বরই চেনে; আর চিকন কচি স্বরে, নিরুচ্চারে কেবলি জগমগির নামই উচ্চারণ করে। জগমগি। জগমগি। জগমগি! "শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে" তেমনি করে সেই অদৃশ্য পাখির ছানা শুধু জগমগিকেই ডাকে।

বড় হাকিম, মেজ হাকিম, ছোট হাকিমের সামনে বসে, জাবদা খতিয়ান খুলে, ভাউচার দেখাতে দেখাতে, এন্ট্রি বেঝাতে বোঝাতে, পার্টনারশিপের দলিলের রেজিস্ট্রেশান অ্যাপ্লিকেশানের রিনিউয়ালের রসিদ বের করতে করতে পূর্ণ, সেই পাখির ছানার ডাক কেবলি শুনতে পায়।

মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বলে, কি যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ।

আবারও ফিরে যায়, খাতাপত্তর দলিল-দস্তাবেজ, প্রফিট অ্যান্ড লস এ।

জীবনটাও, প্রত্যেক মানুষের জীবনটাও, একটা ব্যালান্স শিট। প্রত্যেককেই অ্যাসেটস আর লায়াবিলিটিজকে নিক্তিতে সমান করতে হয়। এ এক ভেলকি। আব্রাকাডাব্রা। যে কোনো ব্যবসায়ীর ব্যবসার যেমন, মানুষের জীবনেরও তেমন; রেওয়া-মিল করে দিয়ে, সম্পত্তি আর দেনা বরাবর করে দেওয়ার ম্যাজিক কেবল পূর্ণর মতন অ্যাকাউন্ট্যান্টরাই জানে।

এবারে উঠে পড়ল। ভাবনা ছেড়ে, স্বপ্ন ছেড়ে, আলো ছায়ার শতরঞ্জী বিছানো বনতল ছেড়ে। অনেক পথ। যেতে হবে হেঁটে হেঁটেই।

যিনি আসছেন সেই ইনসপেক্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কেমন দেখতে হবেন, কে জানে। মেজাজই বা কেমন হবে, কে জানে। কোন কোন সাহেব আসেন, বেশ সাহেব-সাহেব দেখতে, সাহেব-সাহেব হালচাল। কাউকে বা আবার গুড়ের হাঁড়িতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতন দেখতে। কাউকে হুলো-বেড়ালের মতন। কাউকে বা হিমালয়ান ভাল্লুক। কোন কোন ক্ষেত্রে চেহারার সঙ্গে স্বভাবের মিল থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই বিপরীত।

কিন্তু সাহেবদের চেয়ারটাই আসল। ফাটা বা ফুটো বা ভাঙা চেয়ারে বসলেও যিনি তাতে বসেন, তিনিই সাহেব। স্যার, দন্ডমুন্ডের কর্তা, হুজৌর ; মাই-বাপ। কে জানে! উনি কেমন দেখতে হবেন? দুশো বছর ইংরেজরা চেয়ারে বসত, তারও আগে নবাব বাহাদুররা, পাঠান, মোগল, হূণ, তৎখতএ ; তাই এখনও হুজৌর, সাহেব।

কখনও কিন্তু কেউ রাজা বা মহারাজ বলে না। ভারতবর্ষর রাজত্বর ইতিহাসে

হিন্দুদের বিশেষ কোন স্থান ছিল না বলেই কি এমনটা হয়েছে? কে জানে! পন্ডিতেরাই বলতে পারবেন।

পূর্ণ ভাবে, ঠিক আছে। সেলাম ঠোকো, স্যার স্যার করো, হুজৌর মাই-বাপ বলো; তাও সয়, কিন্তু এসব কি?

চাকর-বাকরের মতন এই খিদমদগারি যারা করে, তারা উকিল নয়। তাছাড়া, তাদের হয়ত অন্য মতলবও থাকে। "হুজুরের নামে" চাঁদ-সূর্যও চাইতে তাঁদের বিবেকে বাধেনা মক্কেলদের কাছ থেকে অথচ অনেকই হুজুর বেচারারা ঘূণাক্ষরে জানতেও পান না।

"ঘোষাকি" মানুষটা আরও সরেশ। গাদনে আর রূপীন্দাপুরে দুখানি বাড়িই করে রেখেছে হুজুরদের খাতিরদারী করবার জন্যে। একটি পাহাড়ে, একটি সমুদ্রে। এই নিম্নস্তরের মানুষগুলোকে কোন দিনই বোঝান যাবেনা যে, জীবিকা আর জীবনে ফাঁক রাখা দরকার। না রাখতে পারলে, থুথু ফেলে ডুবে মরাই ভাল।

এই সমস্ত ব্যাপার, নসু মোক্তার করে বলেও, নসু মোক্তারকে ছেড়ে দেবে, অনেকদিনই হল ভাবছে পূর্ণ। তবে, তাকে ছেড়ে সে অন্য কারো কাছেও যাবেনা। 'ঘোষাকি' অথবা নিশিকান্তবাবুর কাছেত নয়ই! হনুমানলাল জৈন-এর কাছেও নয়, তাঁর প্রতিবেশী গোপিনাথবাবু তাঁকেও বলেওছিলেন একবার। নাঃ। এই সাধারণ্যের মধ্যে এই রকমভাবে তার জীবন নষ্ট করতে সে আর রাজী নয়। এর চেয়ে সাইকেল-রিকসা চালাবে, মোট বইবে; এত লোকের মন যুগিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে ; আর বাঁচবে না।

ভেগেই যাবে এখান থেকে। সত্যিসত্যিই ভেগে যাবে একদিন। কিন্তু জগমগি? জগমগিই তার আসল বন্ধন, নসুমোক্তার নয়। এ কথা বোঝে।

পালিয়ে যাবে ভাবে, সবসময়েই পূর্ণ। কিন্তু ভাবেই। ও জানে যে, লাগতেও যেমন জোর লাগে, ভাগতেও লাগে। এই অভ্যেসের বাঁধন, সকাল থেকে রাতের এই অভ্যেস ছেঁড়া, ভারী কঠিন। অথচ ইচ্ছা করে খুবই।

পূর্ণ এখন সাইকেল হাতে হাঁটছে। মাথার উপরে কার্তিকের নীল আকাশ। আজ অমাবস্যা। নাথুদার সঙ্গে জগমগিও উপোস করবে আজ।

পূর্ণ বলে, তুমি না মুসলমান?

হ্যাঁ। নামাজ ত পড়ি। জানোনা বুঝি? মুসলমান মা-বাবার ঘরেইত জন্ম।

তবে?

তবে কি? আমাদেরও ত রোজা রাখতে হত। তাত বহুদিন হল রাখিনা। তার বদলে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশীতে উপোস করি। ঐ একই হল।

হাসে পূর্ণ। বলে, তুমি জাত খোয়ালে জগমগি।

জানো, জাত ছাড়াও অনেক বড় কিছু আছে খোয়ানোর। তোমার জন্যে সর্বস্ব খোয়াতে পারি। তুমি চাইলে। তুমি চাও কই?

নাথুদাত চেয়েছে। আমার জন্যে খোয়ালে তবু আমার একটু গর্ব হত।

কেন? নাথুদাদা মানুষত ভাল।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলেছিল, নাথুদাদা (সব সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে, আগড়ুম বাগড়ুম করে, তাও কি সে বোঝে? আমিও আরবী-ফারসী মুখস্থ বলে দিই, নামাজ পড়ি কতবার দিনে, আমিও কি তার সব মানে বুঝি? মানুষের জাত ধর্ম সব বাজে। ইনসানিয়াৎই হচ্ছে আসল জাত। নইলে, যে মুসলমানের সঙ্গে আমি বেরিয়ে আসি, সে কি? তার কোন জাতই নেই। সে একটা বজ্জাত। আর হিন্দু নাথুদাদার কি দায় পড়েছিল, নিজে জাত খুইয়ে আমাকে আশ্রয় দেবার?

অবাক হয়েছিল পূর্ণ, সেকথা শুনে। যে জটিল প্রশ্নের সমাধান বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় মৌলবী আর মোল্লারাও করতে পারে না, সেই কথাটাই কেমন সহজে বলে ছিল জগমগি। কিছু মাত্র না ভেবে, তার অন্তরের স্বাভাবিক সারল্যে, আর আন্তরিকতায়।

পথের উপরে কি একটা পাখি বসে আছে। বেশ বড় পাখি। কি পাখি, তা দূর থেকে ঠাহর করতে পারল না।

তাহলে, পাখি শিকারের ব্যাপারটা মিথ্যা নয়।

পূর্ণ হেঁটে যাচ্ছে রোদ্দুরে-ছায়ায়। ছায়াতে এলে, শীত শীত করছে, আবার রোদে গিয়ে পড়লে, গা গরম হয়ে যাচ্ছে। তার সাইকেলের প্যাডল ঘুরছে। চেইনএ কির-কির করে আওয়াজ উঠছে। বনের নৈঃশব্দর মধ্যেও যে শব্দ থাকে একরকম, মরা নদীর স্থবির সোঁতার মধ্যেও যে চলার স্মৃতি ; এই সব মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে পূর্ণর মনে।

ডানদিকে যতদূর চোখ যায়, ময়ূরাক্ষীর সোঁতা, ধান কেটে নেওয়া কার্তিকের উদলা মাঠ। ধানের গোড়াগুলো হলুদ হয়ে গেছে।

এবারে জলের পাশে পাশে কিছু কাঁদাখোচা চোখে পড়ল। উড়ছে বসছে। কিচকিচ করছে।

তবে, আছে পাখি।

আর একটু এগোতেই, বড় পাখিটাকে চিনতে পারল। শকুন। একটা মরা শিয়ালের উপরে বসে আছে।

শিয়ালটা মরল কেমন করে? নিশ্চয়ই সাপের কামড়ে। একটা নয়, শকুন

অনেকগুলো। তাদের লম্বা দগদগে গা-শিউরে-ওঠা লাল-রঙা গলা আর বড় বড় ডানায় ঝপঝপ শব্দ করে কামড়া-কামড়ি করছে। তাহলে এও পাখি। শকুন-শিকারী ত দেখেনি এর আগে!

কীই বা দেখেছে ও! দেখবে, আস্তে আস্তে। জীবনের অনেকই বাকি আছে।

ও যখন আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জায়গাটাতে পৌঁছল, তখন শেয়ালটাকে সাবড়ে দিয়েছে শকুনেরা। মরা-পচা শিয়ালের দুর্গন্ধ, শকুনের গায়ের দুর্গন্ধ, রক্ত, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, খুবলে-নেওয়া চোখের শূন্য-কোটর, মাংসহীন চোয়াল, সারি সারি দাঁত।

কঙ্কালের দাঁত। ইসস।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ঐ জায়গাটা এড়িয়ে গিয়ে, আবার পথে পড়ল পূর্ণ।

এখানে সুগন্ধ। পথ-পাশের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ছে। মনেই হয় না এখানে এলে, এই সংসারে মৃত্যু আছে, অসুন্দর কিছু আছে। ভাল লাগতে লাগল ওর আবার, সব খারাপ লাগা মুছে গিয়ে।

কতক্ষণ ধরে হাঁটছে ধুতি আর চটি পরে, খেয়ালই করেনি। হঠাৎই যেন রোদ্দুরটা ঠান্ডা মেরে গেল। লক্ষ করল, সূর্য হেলছে পশ্চিমে। অন্ধকার হবার আগে ডাক-বাংলোতে পৌঁছতে পারলে হয়। এটা ডাক বাংলো নয়, মানে, পি-ডাব্লু-ডি'র বাংলো নয় ; ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের বাংলো বোধহয়।

ডানদিকে এবার নদীটাকে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎই চোখে পড়ল দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চান করছে। গেরুয়া বালি, সাদা জল, উপরে নীল আকাশ, বিদায়ী সূর্যের কমলা আভা পড়েছে জলের উপরে, ওদের গায়ের উপরে। একজন পিছন ফিরে আছে পূর্ণর দিকে। সরু কোমর, সুন্দর দুটি পা ; সুডৌল নিতম্ব। বন-গন্ধী। কোমর-ছাপানো চুল।

কালো রঙ মেয়েটির।

অন্যজন পাশ ফিরে আছে। ধবধবে ফর্সা সে। বাদামী চুল। পরিপূর্ণ পাকা সিঁদুরে আমের মতন দুটি বুক। জল-ভেজা। কমলা-রঙা আলো পড়ে, কোন অচিন দেশের অদেখা পাখি বলে ভ্রম হচ্ছে। একটি সবুজরঙা গামছা দিয়ে দু'হাত তুলে সে ভিজে চুল ঝাড়ছে।

প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো হাঁস। কাছেই গ্রাম আছে।

কোন কিশোরী-কণ্ঠ দূর থেকে ডাকছে হাঁসেদের, ও চৈ-চৈ-চৈ-চৈ-চৈ-। হাঁসেরা একটু পরেই জল ছেড়ে উঠে হেলতে দুলতে যাবে গাঁয়ের সেই বাড়ির

দিকে, যে বাড়ি থেকে এসেছে তারা। চোখে না দেখেও, পূর্ণ, খোল আর খড়ের গন্ধ পেল নাকে। গরুর গায়ের গন্ধ, গোবর-লেপা উঠোনের গন্ধ, খেজুর গুড়ের গন্ধ।

মনটা উদাস হয়ে গেল। আসন্ন সন্ধ্যায়, কার্তিকের এই আশ্চর্য সুন্দর ছবিতে ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ও কোনদিনও কোনো নগ্না নারীকে দেখেনি কাছ থেকে। দূর থেকেও নয়। এই প্রথম দেখল। দেখতেই, জগমগির কথা মনে হল। মনে হতেই, দম বন্ধ হয়ে এল ওর। উত্তেজনায়, কষ্টে, বুক-ধড়ফড় করতে লাগল।

ও পড়ল বিপদে। এই ছায়াঘন বনপথে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওরা ভাবতে পারে, ও লুকিয়ে ওদের চান দেখছে। আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেও ভাবতে পারে, কুমতলব আছে। হঠাৎই বুদ্ধি করে টিউব-পাংচার হওয়া সাইকেলেই উঠে পড়ে রিমের উপরেই সাইকেল চালিয়ে সাইকেলের ঘন্টা বাজাল জোরে এবং মুখটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে রইল, যেন বন দেখছে ; নারী-ধন নয়।

রিমটা তুবড়ে যাবে। যাক। নসু মোক্তারের নস্যি-নেওয়া নাকটাকে তুবড়ে দিতে চাইছে ও। যাক, তুবড়ে যাক সব। এতক্ষণ পেটের খিদের কথা ভুলে ছিল। হয়ত মরেও গেছিল। এখন পেটের খিদেটা হঠাৎ মধু-মকরধ্বজ খাওয়ানো রোগীর মত ধড়ফড় করে বেঁচে উঠল এবং তারই সঙ্গে নগ্ন-নারীর শরীরের দৃশ্যে অন্য এক রকমের খিদে তার শরীরে চনমন করে উঠে তাকে বড় অস্বস্তির মধ্যে ফেলল। এই খিদেও যে তার ভিতরে ছিল, তা এত বছরে তেমন জানার অবকাশ হয়নি। পেটের খিদে নিয়েই এমনই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে... ...

মেয়ে দুটি সাইকেলের আওয়াজ শুনেই আবার সাত তাড়াতাড়ি জলে নেমে পড়ে, জল দিয়ে তাদের নগ্নতা ঢাকল। উঁচিয়ে রইল শুধু মাথা দুটি। ওদের ডান পাশে রেখে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে একবার, যেন ওদের দেখেইনি, এমনি করে, ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। নাকে কি যেন গন্ধ এল। হঠাৎ মনে হল, হাঁসেদের গন্ধের সঙ্গে নারীদেহর গন্ধ পেল জলে। সোঁদা সোঁদা, মিষ্টি মিষ্টি নোনতা নোনতা স্বাদ, সেই গন্ধে। গন্ধেরও স্বাদ থাকে। যে জানে ; সেই জানে।

দুটি কান গরম হয়ে, লাল হয়ে গেল পূর্ণর।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, সাইকেল থেকে নেমে পড়ল ও।

এখান থেকে ফার্লং খানেক গিয়ে, একটা সমকৌণিক বাঁক আছে পথে। সেই বাঁকটা ও চেনে। কারণ, সেই বাঁক থেকে পাক্কা তিনমাইল হল ঘাঁতির সেই মক্কেলের বাড়ি। নাসিরুদ্দিন মিঞা। কাছে যে গ্রাম আছে, সেটিও মুসলমানেদের

গ্রাম। মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, নতুন রঙ করা। পাশেই একটি হিন্দু গ্রামও আছে।

মেয়ে দুটির বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। ওদের কি ধর্ম, কে জানে। জগমগির কথা মনে হল ওর। মানুষের কোন ধর্ম নেই, ইনসানিয়াৎই ধর্ম।

লালন ফকির গেয়ে ছিলেন ঃ

"যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান?"

মনে পড়ল।

জগমগি যা বলে, তা পূর্ণ মানতে পারে, নাথুদা মানতে পারে ; পৃথিবীর অনেকেই তা মানেনা যে, এটা দুঃখের কথা।

এবারে বাঁক পেরিয়ে এগিয়ে এসে বাংলোটা দেখা গেল। যেপথে প্রতিবছর ও ঘাঁতি যায়, সেই পথ ছেড়ে এবারে বাংলোর পথে এগোল।

দূর থেকে দেখতে পেল। পদার বাংলো। নামের কি ছিরি! একটিই ঘর বাংলোতে। সামনে চওড়া বারান্দা। উঠোনেরই এক কোনাতে একটা বড় শিউলিগাছের নিচে মাটিতে গর্ত করে উনুন করা হয়েছে। কাঠের উনুন। কাঠপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। কড়াইতে কি যেন চাপানো আছে। কাঁচালঙ্কা কালোজিরে ফোড়ন-এর সমবার দেওয়ার গন্ধে বুঝল যে, মুসুরের ডাল। সন্ধের বনজ গন্ধ ও নদীর গন্ধের সঙ্গে, ডালের গন্ধ মিশে গেল।

হরিষ ইনসপেকটর বললেন, কি রে? তোর জন্যে চিন্তায় পড়েছিলাম আমরা। তোকে কি শেয়ালে খেল, না ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে পড়লি, না কি সাপেই কামড়াল, আমরা চিন্তা করে মরি। এদিকে তাঁদের আসার সময়ও পেরিয়ে গেল।

পূর্ণ বলল, ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে নয়, তবে পড়েছিলাম বিপদে।

কি বিপদ?

মেয়ে দুটির কথা না বলে, ও-কথা ঘুরিয়ে বলল, সাইকেলের টিউব পাংচার হয়ে গেছিল। প্রায় পুরোটা পথই হেঁটে এলাম। সাইকেলটাকে ঠেলে আনতে না হলে, অনেকই তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম।

তা, ফেলে রেখে এলিনা কেন এটাকে। এটার আছেটা কি? নসু, গোয়ালার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল চার বছর আগে, আমি জানি।

নিয়ে নিয়েছিল মানে?

মানে, গরু কেনার টাকা ধার দিয়েছিল। সে টাকা সব শোধ করতে পারেনি গোয়ালা তাই ওর সাইকেলটাই কেড়ে নিয়েছিল। যতটুকু উসুল করা যায় আর কী। সাইকেলটাত ফোকটে মারা। তোর নসু মোক্তার কি সময়ে টিউবটাও বদলে

দিতে পারে না?

টিউবের দোষটা পুরোটা নয়, টায়ারের অবস্থাও সাঁতরাগাছির ওল-এর মতন হয়েছে বহুদিন হল।

নে নে। কথা পরে হবে। হাত মুখ ধুয়ে, আগে খেয়ে নে দেখি। এই বিষাদ। বিষাদ কোথায় গেলি?

বিষাদ এসেছে নাকি? হরিষদা?

উৎফুল্ল হয়ে বলল, পূর্ণ।

না এসে পারে। তুই আসছিস শুনে গন্ধে গন্ধে চলে এল। তার উপরে কেয়ার অফ নসু মোক্তার, এমন ভোজ। তোর একজন সঙ্গীও হল।

বিষাদ, হরিশদার ছোট ভাই। হরিনাথপুরের স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই। গান বাজনারও ভারী সখ। বিষাদই একমাত্র বন্ধু হরিনাথপুরে পূর্ণর।

বেলা পড়ে গেল।

পূর্ণ, মাছের ঝোল আর লাবড়া দিয়ে ভাত খেয়ে আচিয়ে উঠেছে, এমন সময়ে, সূর্য অস্ত গেল একটা মস্ত ঝাঁকরা তেঁতুল গাছের আড়ালে, পশ্চিম দিগন্তে এতক্ষণ যে লাল আভা ছিল, তা পুরোপুরি মুছে দিয়ে।

ঠাণ্ডা জলে আঁচানতে, হাত শিরশির করছিল কিন্তু শিরশিরানি আরও বেড়ে গেল হঠাৎই ঠাণ্ডাটা। কেটে-নেওয়া ধানের মাঠ পেরিয়ে ; যেন রঘু ডাকাতেরই মতন নদীর উপরের পাতলা ধোঁয়া-ওঠা জল পেরিয়ে রণ-পায়ে চড়ে এসে হৈ হৈ করে পৌঁছে গেল এপারে। পূর্ণর হাড় হি-হি করে উঠল। গরম জামা বলতে, একটি পুরনো সোয়েটার আর সবেধন নীলমণি ফুটো-ফাটা আলোয়ানটি। সে সবই ত উর্দ্ধাঙ্গে। উর্দ্ধাঙ্গের চেয়ে নিম্নাঙ্গে ধুতি ভেদ করে ঠাণ্ডা লাগে বেশি। হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে তিনটে। একটা আছে আই.এ.সি. যে ঘরে থাকবেন, সেই ঘরে। আরেকটা আছে বারান্দাতে। অন্যটা শিউলি গাছের ডাল থেকে ঝুলছে।

চারদিক আলো করে একটা একটানা মৃদু সিঁ-সিঁ শব্দ করছে হ্যাজাকগুলো। রান্না করার সময়ে চামচিকে বা পোকা-মাকড় এসে যাতে না পড়ে হাঁড়ি-কড়াতে, তারই সুরক্ষা হিসেবে জ্বালানো হয়েছে এতগুলি হ্যাজাক।

হরিষদা, নিজে থেকেই বললেন। বেশি খাসনি ত পূর্ণ ভূষিমাল? রাতেই ত আসল ভোজ।

যা খিদে পেয়েছিল! মেনু কি? রাতের?

এমনিতে লাজুক এবং মিতবাক পূর্ণ, হঠাৎই সপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল।

পূর্ণর যত কথা, সব তার নিজেরই সঙ্গে। নিজে বলে, নিজেই শোনে।

মেনু?

হরিষ ইন্‌সপেকটর, এই উদোম জায়গার "পারফোর্স" ড্যাগমাস্টার ; যেন পূর্ণর এই হঠাৎ ঔৎসুক্যে মজা পেয়ে, বলে উঠল।

হ্যাঁ। পূর্ণ বলল।

পোলাউ।

বলেই, একটু থামল হরিষ। ভাবছিল, করে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী। কয়েকবছর পরে সে নিজেও ছোট-হাকিম হবে ; অথচ কর্তা-ভজার জন্যে এখন পাচক-চাকরদের সুপারিভাইজারী করতে হচ্ছে।

পেট, মানুষকে দিয়ে কত কিই না করিয়ে নেয়, স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়।

বলল, মেনু হল, হলুদ পোলাউ, বাদাম পেস্তা কিসমিস জাফরান দেওয়া। পাঁঠার মাংস। মানে, কালিয়া। কাবাব চিনি পড়েছে। জিভে লাগলেই আর দেখতে হবে না। মনে করবি, সবটাই খেয়ে নিতে পারলে ভাল হত। ঝমু'র, মানে, তোর বৌদির, এই পোলাউ আবার খুবই প্রিয়।

বিষাদ শুনছিল। বলল, ঠাণ্ডার দিন। বৌদির জন্যে, ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেলে হয় না কিছুটা। কাল?

হরিষদা বলল, তুইও যেমন! কিছু বাঁচলে ত। দুগাড়ি হা-ভাতে সৈন্য আসছে জেনারালের সঙ্গে। হামলে পড়ে, সব সাবড়ে দেবে। তার ওপর আবার খাবার আগে পেটে পড়বে লাল জল। দানো ঢুকে বসে থাকবে এক একজনের পেটে।

তারপর বলল, আই.এ.সিকে এমন খুশি করার পরও হনুমানলাল জৈন-এর পার্টনারশিপের রেজিস্ট্রেশান রিফিউজ করে, এমন বুকের পাটা আছে কোন হাকিমের? ভগবান উবাচঃ বলে কথা! সাধারণ মনিষ্যির কি করার আছে? তবে, সকলেই বলে, এই আই. এ. সি. মানুষটার বুকের পাটা আছে। মাল খায়, মেয়েছেলে করে, কিন্তু কলম যখন হাতে তুলে নেয় তখন হাত কাঁপেনা একটুও। যেমন খায়, হাগেও তেমন। ঠিকঠাক। একেই বলে, মরদের বাচ্চা।

বিষাদ এবং পূর্ণ দুজনেই হরিষদার এই উপমাতে একটু ধাক্কা খেল। একই পরিবারে জন্মে, একই বাবা মায়ের সন্তান হয়েও ; রুচিতে, মানসিকতায়, ব্যক্তিত্বে একজন অন্যজনের থেকে কতটা আলাদা হতে যে পারে ; তাই ভাবছিল পূর্ণ।

তাই? আই.এ.সির নাম কি?

পূর্ণ শুধোল।

এ.পি.এম।

কিসের অ্যাব্রিভিয়েশান?

তা, বলতে পারব না।

কেন?

জানি না বলে। কলেজের প্রফেসর, বড় আমলা, ওঁদের সকলেরই এমনই নামকরণ হয়ে যায়।

কেন?

তা, বলতে পারব না। ভাবিনি তা নিয়ে।

বলেই, হরিষ বলল, পূর্ণকে, তোর ঘরের সামনের ঘরে যে মেয়েটা থাকে, জগমগি না কি যেন নাম, সে এখন কোথায়?

হরিষদাদার এই আচমকা প্রশ্নে পূর্ণ একেবারেই হকচকিয়ে গেল।

বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন? হরিষদা?

হঠাৎ নয় রে ইডিয়ট! এইটাই প্রশ্ন।

কেন?

এবার পূর্ণর গলাতে রুক্ষতা লাগল।

বিষাদ, বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বলল, এর মধ্যে জগমগি এল কোত্থেকে?

কোত্থেকে আবার? নসু মোক্তার আর ঘোষাকির চক্রান্ত। এ. পি. এম. এই বাংলোতে থাকবেন তিনদিন। আজকে খাওয়া দাওয়া। কালকে পাখি শিকার। পড়শু জগমগি শিকার। তার আগে, অবশ্য গান বাজনাও হবে। সেসব ক্যামোফ্লেজ।

পূর্ণর বুকের মধ্যটা ধুক পুক করে উঠল। তারপর রাগ ধুমায়িত হতে লাগল ওর মধ্যে।

ও বলল, মানে?

মানে, আমি জানিনা। হরিষ বলল। সে নাকি খুব ভাল গায় আর নাচে? দেখতেও নাকি খুবই ভাল। বিষাদের কাছেও শুনেছি।

তাতে কি?

বিষাদ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি তোমাকে...

বিষাদের দিকে ফিরে, পূর্ণ বলল, তুই বলেছিস ওর কথা? বিষাদ?

বিষাদ এই কথাতে আহত হয়ে, পূর্ণকে বলল, তোর কি মাথা খারাপ?

তার স্বামী গাথু না নাথু? তাকে একহাজার টাকা আগাম দেওয়া আছে। আরও দেবেন ওঁরা। গাড়ি পাঠিয়ে নাথু না গাথু আর জগমগিকে এখানে পড়শু নিয়ে আসা হবে। নাথু সিদ্ধি খেয়ে তুলসীদাস আবৃত্তি করবে বারান্দাতে বসে আর তখন

দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে এ. পি. এম. একা একা জগমগির গান শুনবে, নাচ দেখবে। এ. পি. এম সিদ্ধিলাভ করবে।

গান ত জগমগি শুনেছি, ভালই গায়। নাচেও নাকি?

বিষাদ স্বগতোক্তি করল, বন্ধুর হয়ে।

হরিষদা বলল, নাচেনা কে? নাচে সকলেই। কিন্তু সবাই কি সবাইকে নাচাতে পারে? "যিসকা বান্দরী ওহি নাচায়।"

এ. পি. এম, হয়ত নাচিয়ে নিতে পারবে বলেই নাচের কথা উঠেছে।

পূর্ণ অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, জগমগি খারাপ মেয়ে নয়। তাছাড়া, নাথুদাও মানুষ খারাপ নয়। মহৎ মানুষ। ওদের কোন লোভও নেই। ওরা কেন অমন করতে যাবে?

হরিষ, হেসে বলল, পরে জানতে পাবি যে, টাকা ছাড়াও সংসারে লোভ করার মতন আরও অনেক জিনিসই আছে পূর্ণ। টাকার লোভটা হচ্ছে ন্যূনতম লোভ।

কি, সেই সব লোভ?

কি নয়? তাই বল?

আমি জানি না।

পূর্ণ বলল।

জাতে ওঠার লোভ, সমাজের কেউ-কেটা হবার লোভ ; হরিনাথপুর রোটারী ক্লাবের দেয়ালে নিজের ফোটো ঝোলাবার লোভ ; প্রেসিডেন্ট হয়ে। যশের লোভ, ক্ষমতার লোভ, পুরস্কারের লোভ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হবার লোভ। লোভের কি শেষ আছে রে! যারা, গরীবস্য গরীব তারাই লোভ বলতে শুধু টাকার লোভই বোঝে! একটু ভাল খাওয়া, একটু ভাল পরা ; এই সবই তাদের লোভের সংজ্ঞা।

ইউ. ডি. সি, রহমানদাদা বলল, তাছাড়া, ভাল খারাপের তুমি কি বোঝ বাছা? তোমারত গোঁফই এখনও শক্ত হয়নি। এই জগতের হাল-হকিকৎ, খাল-খরিয়াৎ তোমার বুঝতে আরও অনেক সময় লাগবে। ঘোমটার তলায় খেমটা নাচই ত চলছে সব জায়গায়। সে তোমার বড় বড় হাকিমই বল, সাবজাজই বল, উকিল মোক্তারই বল ; আর জগমগিই বল। বাইরে থেকে যতটুকু দেখ, সে ত বাহ্য! সংস্কৃততে সেই একটা কথা আছে না? ইহা বাহ্য, আগে কহ আর। সেই।

পূর্ণর মাথার মধ্যে ভনভন করছিল রাগ। রক্ত দাপাদাপি করছিল কপালের দু পাশের রগে। মাথাতে যন্ত্রণা হচ্ছিল। একেই কি বলে প্রেসার বেড়ে যাওয়া? জানেনা পূর্ণ। কখনও প্রেসার-টেসার মাপেনি ও।

পূর্ণ বলল, আচ্ছা রহমানদাদা, এ. পি. এম এর এই সবই যদি ধান্দা ত, রানীর হাট থেকে খারাপ মেয়ে আনলেই ত পারতেন ঘোষাকি আর নসু মোক্তার ওঁর জন্যে?

হো হো করে হেসে উঠল হরিষ।

বলল, বোকাই চন্দর। মেয়ে মাত্রই ভাল। মেয়েদের মধ্যে খারাপ কেউই নেই। একজনও না। অভিজ্ঞতা নেই, তাই এমন বোকার মত কথা বলছিস।

পূর্ণর, এই সব স্থূল এবং তার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অপমানকর আলোচনা, ভাল লাগছিল না আদৌ। রাতে ত রাঠোড়ের বনের পথ দিয়ে হরিনাথপুরে ফেরা যাবে না। গেলে, আজ রাতেই ও ফিরে যেত জগমগির কাছে।

গিয়ে, যা হয় করত কিছু একটা।

সাইকেলটাও যদি ঠিক থাকত।

মনে মনে ঠিকই করে ফেলল, নসু মোক্তারের এই চাকরী ও আর করবে না। "ননীবালা" সিনেমা হলের সামনে বসে জুতো পালিশ করে যদি খেতে হয়, তাও বরং খাবে কিন্তু এই নোংরামি আর খিদমদগারির চাকরীতে আর নয়।

হরিষ বলল, এক কাপ করে আদা-লং দিয়ে চা খেলে হতরে রহমান। ঠাণ্ডায় যে শালা বীচি জমে গেল।

হরিষদার দিকে চেয়েছিল পূর্ণ।

ইনকামট্যাক্সের অফিসের বড় বড় ঘরওয়ালা প্রাচীন বাড়িটার মধ্যে ফাইল বগলে বা টেবলের সামনে ফাইল পেতে বসে-থাকা, গম্ভীর, রাশভারী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত হরিষদার মধ্যে যে এই হরিষদাও ছিল তা আদৌ জানা ছিল না। একজন মানুষের মধ্যে যে অনেকইজন মানুষ থাকে এবং সেই সব মানুষেরই প্রকৃতি যে, পরস্পরবিরোধীও হয়, একথা জেনে ওর অবাক লাগছিল।

ও নিজেও কি ঐরকমই একজন মানুষ? ওর মধ্যেও কি একজন হরিষদা আছে?

কে জানে। তবে, যাই হোক, এই সিদ্ধান্ত সে পাকা করে ফেলেছে, যে চাকরী আর করবে না। এই চাকরী।

রহমানদাদা চায়ের কথা বলতে গেল।

দুজন ঠাকুর এসেছে এবং দুজন যোগানদার। আর রাজ্যের বাসনকোসন। বস্তাতে করে চাল ডাল, ঝুড়িভরা আনাজপত্র, মশলার ঠোঙা, তেলের ঘি-এর হাঁড়ি, নানারকম মিষ্টির প্যাকেট এবং হাঁড়ি। রহমানদাদা আদা আর লং দিয়ে বানানো স্পেশ্যাল চায়ের অর্ডার দেবার জন্যে ওদিকে গিয়ে বড় বড় কাঠের

উনুনের আগুনের পাশে একটা টিনের চেয়ার পেতে বসে হাত-পা গরম করতে লাগল। ঠাণ্ডাটা ক্রমশঃই বাড়ছে।

বিষাদ আর পূর্ণ বাংলোর সামনের হাতাটাতে পায়চারী করছিল। ঘরের ভিতরের এবং বাইরের হ্যাজাকের আলো ও উনুনের আলোও ছিল। চলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। তাছাড়া, এখন সাপের ভয়ও নেই।

বিষাদ বলল, কিছু মনে করিস না। দাদাটা অমনই।

না। অমনই বলি কি করে! উনি ত অমন নন। অফিসে ত কত কাজই করতে হয়। কাজ পড়ে আমার ওঁর সঙ্গে, সেখানে ত উনি অন্য মানুষ।

তা হবে। কিন্তু দাদার মধ্যে কোন রসকষ নেই। রসিকতা বোঝেনা। গান ভালবাসে না। গল্প-উপন্যাস পড়ে না। শুধু তাস পেটে আর বগাদার সঙ্গে তাদের বাড়ি বসে প্রতি সন্ধেতে মদ গেলে। বাড়ি ফিরে প্রায় দিনই চেঁচামেচি করে। আর একই কথা বলে। রোজই।

একই কথা মানে?

মানে, একই কথা। একই বাক্য, ক্যাসেট প্লেয়ারের মতন বাজিয়ে চলে। ডিস্‌গাস্টিং।

একটাই বাক্য?

না বাক্য একটা নয়। ধর, আধঘন্টার বক্তৃতা। কিন্তু প্রতিটি বাক্য প্রতিদিনই বলবে। নতুন একটিও শব্দ নেই তাতে।

কি বিষয়ে? বক্তৃতা?

বউদির ও বউদির বাপের বাড়ির বিষয়ে। বৌদি, গরীব ঘরের মেয়ে। বৌদির দাদা একটা মোটর সাইকেল দেবেন বলেছিলেন। তখনত দাদা ইনসপেক্টর হয় নি। ইউ. ডি. সি ছিল। আজ দাদার অনেক রোজগার। তোরা কি জানিস না জানিস জানিনা, একই বাড়িতে থাকি, তাই আমি অবশ্যই জানি যে; দাদার এই অ্যাফ্লুয়েন্স শুধুমাত্র চাকরীর আয় থেকে হওয়া সম্ভব নয়। একেবারেই নয়।

কিছু বলিস না কেন?

এই ত মুশকিলে ফেললি। কেউই বলিনা কিছু। না মা, না বৌদি; না আমি। একমাত্র ভাই। টাকা এমনই একটা জিনিস যে, তার ব্যাখ্যা হয় না।

কেন? বলিস না কেন কেউ? যদি নিশ্চিতই জানিস?

বিষাদ একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে টাকা যেভাবেই রোজগার করা হোক না কেন, সে টাকা যখন বাড়িতে এসে ওঠে, তখন তার সব দোষই চলে যায়। তখন তা সাক্ষাৎ "মা লক্ষ্মী" হয়ে যায়। সকলের মুখেই, টাকা দেখে

হাসি ফোটে।

তারপর আয়ার মাইনে কোত্থেকে আসে? বউদির ভাল ভাল শাড়ি, গয়না? বা চিতল মাছের পেটি বা গলদা চিংড়ি বা তপসে মাছ ভাজা আমাদের মতন মানুষদের পক্ষে কিভাবে খাওয়া সম্ভব, আমার আর দাদার মিলিত রোজগারে; সে কথা সকলে খুব ভাল করে জেনেও ভাব দেখাই, যেন জানি না।

একটু চুপ করে থেকে, বিষাদ বলল, দাদা জমি কিনেছে পাঁচকাঠা চাঁপাপাড়ায়। কর্ণার প্লট। প্ল্যানও করিয়ে রেখেছে, রায় কনট্রাকটরকে দিয়ে। দোতলা বাড়ির। তবে, এখন কিছুই করবে না। হাকিম হওয়ার পরে, আস্তে আস্তে করবে। একনম্বর টাকার সোর্স ত দেখাতে হবে। পি.এফ থেকে লোন নেবে, আমার থেকে লোন নেবে। খরচ দেখাবে, পঞ্চাশ হাজার, খরচ করবে, দেড় দুলাখ।

তা এ নিয়ে তোর লজ্জিত কুণ্ঠিত হবার কি আছে? কে করছে না? কমার্সিয়াল ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে, পুলিশে, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট, হাসপাতালে, পয়সা কে কামাচ্ছে না? তবে হরিষদাকে একা দোষ দিয়ে লাভ কি। আমি-তুই না-কামালেই হল। কেন? আমাদের বড় হাকিম? তিনিও একেবারে অন্যরকম। একসেপশান সব জায়গাতেই আছে। অ্যান্ড একসেপশান প্রুভস দ্যা জেনারাল রুল।

ওদের কথার ছিটেফোঁটা হরিষদার কানে গিয়ে থাকবে ; যদিও, প্রায় যজ্ঞির উনুনের মতন সোঁ-সোঁ শব্দ-ওঠা উনুনের শব্দে আর হ্যাজাকের একঘেয়ে মৃদু শব্দের মধ্যে নীচুগ্রামে উচ্চারিত অন্য কোনো শব্দ কানে যাবার কথা নয়।

ইতিমধ্যে রহমানদাদা একজন যোগাড়েকে সঙ্গে করে, চায়ের কাপগুলো গরম জলে ধুয়ে, গরম করে ; ধোঁয়া-ওঠা কেটলি সঙ্গে করে, ফিরে এলেন উনুনের পাশ থেকে।

বললেন, ধরো ধরো। এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ধুঁয়ো-ওঠা চা খেতে খেতে হরিষদা বললেন, তোকে ক্লান্ত ত অবশ্যই এবং খুব চিন্তিতও দেখাচ্ছে যে পূর্ণ! কি হল তোর? নসু মোক্তারকে ছেড়ে দিবি ভাবছিস? সম্মানের সঙ্গে, মাথা উঁচু করে সৎপথে অন্য কোন জীবিকার সন্ধানে যাবি ভাবছিস বুঝি?

কি করে জানলেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে, পূর্ণ আবার বলল, আশ্চর্য!

ইনটিউশানরে ভায়া, ইনটিউশান। তা, কি করবি, ঠিক করলি কিছু?

না। ভাবছি।

যাই ভাবিস, যাইই করিস ; আজকের ভারতবর্ষে এমন কোন জীবিকাই নেই যেখানে তুই যাকে "নোংরামি" বলিস, তা নেই, খিদমদগারী নেই, পরের মন-রাখা নেই, কর্তা-ভজা নেই, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এমন কোন মেয়েছেলে নেই, তোদের ভাষায় নারী, জগমগির মতন বা মনে কর, আমার বৌয়ের মতন যে, হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সতীলক্ষ্মী। সততা, সতীত্ব ওসব টাইমবারড হয়ে গেছে রে। ইনকামট্যাক্স-এর অ্যাসেসমেন্টস এরই মতন।

আর কিছুই করার নেই। লস অফ রেভেন্যু ; লস্ অফ ভ্যালুজ। যুগ পালটে গেছে, দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছে। হয় স্রোতে ভেসে পড়, নয়, স্রোতের বিপরীতে একা হাতে লড়ে, মরে যা। মধ্যপন্থা বলে আর কিছু নেই। হয় বাঁচো, নয় মরো। বুঝেছ?

পূর্ণ, মাথা নাড়িয়ে সায় দিল, নীরব প্রতিবাদের সঙ্গে। তারপর চায়ের কাপটা রেখে আসতে, উঠে গেল উনুনের দিকে।

চায়ের কাপটা ফেরৎ দিয়ে উনুনের কাছেই বসে রইল, লোহার চেয়ারটার ওপরে।

ও ভাবছিল, হরিষদা, তাঁর স্ত্রীর কথা বললেন কেন? সতীত্বর কথা?

হঠাৎই মনে পড়ে গেল, একদিন, সেদিন সেকেন্ড স্যাটারডে ছিল ; দুপুরে, বর্ষার দুপুর ছিল, শ্রাবণ মাস ; ও বিষাদের ঘরের দরজায় ঠেলা দিতেই দেখেছিল, বৌদি বিষাদের বুকের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। বুকের বোতাম খোলা। বিষাদ কি করছিল কে জানে? দুদু খাচ্ছিল?

ও দেখেই, লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। কান দুটি গরম হয়ে গেছিল লজ্জায়, উত্তেজনায়।

আবদুল করিম খাঁ এর একটি রেকর্ড যোগাড় করে এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে কাজিপাড়ার মক্কেলের ছেলে, সামসের। ওরও গান বাজনার খুব সখ। সেই রেকর্ডটাই বিষাদের ফিলিপস এর হাই-ফাই রেকর্ড-প্লেয়ারে শুনবে বলে ও এসেছিল। বিষাদ জানতও যে, সে আসবে। হরিষদা যেন কাদের নিয়ে রূপোঝুরিতে শ্রাবণী পূর্ণিমার মেলায় যাবেন, জানত পূর্ণ। এসব বিষাদই বলেছিল। তবে যখন যাবে বলেছিল পূর্ণ, তার ঘণ্টাখানেক আগে যদিও পৌঁছেছিল ও, জেনেশুনেও একটুও সাবধানতা ওরা নেয়নি যে, তার মানে একটাই। ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটে গেছিল। যাকে বলে অঘটন!

যদি অঘটন ঘটেও থাকে, হঠাৎ, একবার ; তার জন্যে হরিষদার এত লোকের সামনে নিজের স্ত্রীকে অসতী বলাটা কি উচিত হল?

ভারী আশ্চর্য মানুষ ত!

বিষাদ ওর পাশে এল।

বলল, কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। ওঁরা আজ আসবে বলে মনে হচ্ছে না।

হুঁ।

অন্যমনস্ক গলাতে বলল, পূর্ণ।

তারপর বলল, এলে এল, না এলে, না এল। কাল সকাল হলেই আমি সাইকেল এখানে ফেলে রেখে, ঘাঁতি গিয়ে, সেখান থেকে যে করেই হোক, সোজা গোপিনাথপুরে।

বলেই, চুপ করে গেল।

বিষাদও চুপ করে বসে রইল, ওর মুখোমুখি ; আর একটি চেয়ারে।

কাঠ পুড়ছিলো উনুনে ফুট-ফাট শব্দ করে। কড়াতে মাংস কষা হচ্ছে। দারুণ গন্ধ ছেড়েছে পেঁয়াজ রসুন ঘি-গরম মশলার আর মাংসর। কাঠ ধরে নাড়াচাড়া করলেই আগুনের ফুলকি উঠছে। লাল জোনাকির মত সোজা উপরে উঠে গিয়েই হঠাৎ নিভে গিয়ে, সাদা, ভারশূন্য ছাই হয়ে, হাওয়া-হীন পরিবেশে সোজা নীচে নামছে। সেদিকে তাকিয়ে, পূর্ণ ভাবছিল, ওর স্বপ্নগুলোও এমনই। ওঠে যখন, তখন নরম নীলাভ সবুজ জোনাকি বা গনগনে লাল স্ফুলিঙ্গর মতন দেখায় তাদের, আর যখন পড়ে ; তখন ছাই।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়েছিলেন বিষাদের বৌদি একদিন।

"আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে

দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে হুতাশে"।

বিষাদ অস্ফুটে বলল, কি ভাবছিস?

নাঃ।

পূর্ণ বলল।

কি ভাবছিস তুই, তা আমি জানি।

তুইও জানিস?

পূর্ণ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল।

বিষাদ, শ্লেষটা গায়ে না মেখে বলল ; তোর কাছে টর্চ আছে?

নাঃ।

আমি এনেছি।

চল, ঘাঁতির দিকে এগিয়ে গিয়ে হেঁটে আসি একটু। তুই না হয় অনেকই হেঁটেছিস। আমিত সারাদিন হাঁটিনি। বসে বসে পা দুটো পাথর হয়ে গেছে।

গাড়িতে এসেছিলাম ঘাঁতি। সেখান থেকে সাইকেল রিকশা। তুই দাঁড়া। দাদাকে বলেও আসি আর টর্চটাও নিয়ে আসি।

ফিরে এসে, বিষাদ বলল, দাদা, আর রহমান দা এই জব্বর ঠান্ডাতে "রাম" এর বোতলটা নিয়ে বসে বসে এ. পি. এম. এর মুণ্ডুপাত করছে।

কেন? মুণ্ডুপাত কেন?

আই. এ. সি এসে যদি প্রথমেই খিদমদগারি করতে-আসা ইনসপেক্টরের মুখে "রাম" এর গন্ধ পান তাহলে আর দেখতে হবেনা। সি. সি. আর এ এমন কথা লেখা হবে যে, দাদার হাকিম হওয়াই হবে না, বাড়ি করাও হবে না। এদিকে ঠান্ডাও ভীষণ, রান্নাও দারুণ। অথচ চাকরীটাও করতে হবে। উভয় সংকটে পড়েছে দুজনে। রহমানদাদার এমনিতেই নাকি কি সব গোলমাল হয়েছে। কমিশনারের কাছে কমপ্লেন গেছে।

চল। পূর্ণ বলল।

তারপর বলল, তুই কিন্তু আছিস বেশ। তুই একাই। দিব্যি বাংলা পড়াচ্ছিস। বাড়িতে, দয়াময়ী বৌদি।

"দয়াময়ী" শব্দটা শুনে, বিষাদ মুখটা ঘোরাল পূর্ণর দিকে।

কিন্তু ঘোর অন্ধকারে মুখের ভাব বোঝা গেল না।

পূর্ণ আবার বলল, বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস ছুটি। দিনে দুটি তিনটি ক্লাস। চমৎকার। আমার যদি একটা ডিগ্রী থাকত উনিভার্সিটির।

করপরেশানের কসাই খানার ছাপের মতন?

বিষাদ বলল।

তারপর বলল, দেখিস না? বাজারে পাঁঠাগুলো ঝুলে থাকে পেছনের রাং এ ছাপ মারা। সত্যিই কোথাকার ছাপ, কে জানে? ওরকম রাবার স্ট্যাম্প ত বানিয়েও নেওয়া যায়।

মরা-পাঁঠারাও যদি ডিগ্রীধারী হতে পারে, আমারও স্ট্যাম্প বানিয়ে নিয়ে হতে পারলে ভাল হত।

পূর্ণ বলল।

সেই হচ্ছে মুশকিল।

তুই ভাবছিস, স্কুলের চাকরী ভাল?

ভাল নয়? এমন আরামের চাকরী।

বাংলা বানান সম্বন্ধে তোর ধারণা আছে ভাল? বাংলা বানান সম্বন্ধে কত জনের যে কত মত এবং কত পথ তা কি বলব। এতগুলি বাংলা কাগজ, একেকটা

একেকরকম বানান মানছেন। ফলে, ব্যাপারটা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোনদিন "বাবা" বানানও ভুল হয়ে যাবে।

তাই?

হেসে ফেলল, পূর্ণ।

তাছাড়া, পড়াবই বা কি? স্কুলের সিলেবাস যাঁরা ঠিক করেন তাঁদের কাছে সাহিত্য-কাব্যর উৎকর্ষ বা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের বাংলা জ্ঞান নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই। এখানেও পার্টি-বাজী চলছে চরম। আরে বাবা, কাব্য-সাহিত্যেরও কি আর কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, বি জে পি আছে? কিন্তু সে কথা বুঝছেই বা কে? আর বোঝাচ্ছেই বা কে? এই শিক্ষা-শিক্ষা খেলার চেয়ে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিলেই হয়। কোন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সিলেবাস বহির্ভূত লেখা পড়েই শুধু সাহিত্য-বোধ জন্মাতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই যতখানি মতাদর্শ প্রচারের জন্যে, ততখানি সাহিত্য-কাব্যরসের জন্যে নয়। তার উপরে, কী পলিটিক্স। অ্যাপয়েন্টমেন্টে, প্রমোশনে, ফান্ডস নিয়ে। ল্যাবরেটরীতে কোন ইকুইপমেন্টস নেই। লাইব্রেরীতে যেসব বই আসে, সেগুলোর অধিকাংশই ছাগলের খাদ্য হওয়া উচিত। কোন গুণ বিচার করে যে, এই সব বইয়ের জন্যে গ্রান্ট দেওয়া হয়, তা ওঁরাই জানেন।

আসলে দাদা যা বলছিল, সে কথা ভাববার মতন বটে। সত্যিই দেশে এখন এমন একটি চাকরী নেই, পেশা নেই, যেখানে মাথা উঁচু করে, সততার সঙ্গে কাজ করেও, ভদ্রভাবে জীবন কাটানো যায়। ছেলে মেয়েদের ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় এবং রিটায়ারমেন্টের পরেও ভিক্ষা না-করে বেঁচে থাকা যায়।

উল্টোদিক থেকে একটা তীব্র আলো আর শব্দ দেখা ও শোনা গেল। একচক্ষু দৈত্যর মতন কি একটা ছুটে আসছে এবড়ো-খেবড়ো হেমন্তের ধুলিমলিন নির্জন পথ দিয়ে।

বিষাদ টর্চটা জ্বালাল।

একটা মোটর সাইকেল। সেটা ওদের পাশে এসে থেমে গেল। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক আপাদমস্তক ধুলিধূসরিত ; বললেন, বাংলোটা কতদূরে দাদা? আপনারা কারা? আপনারা কি ইনকামট্যাক্সের লোক?

ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল পূর্ণ? অদ্ভুত পোশাক ভদ্রলোকের। পায়ে হাঁটু অবধি লাল-রঙা মোজা আর বুট জুতো। কিন্তু হাফ-প্যান্ট। গায়ে একটা হাফ-হাতা সাদা-কালো চৌখুপি হাফ সার্ট। কাঁধ থেকে কোমর অবধি আড়াআড়ি করা ইলাস্টিকের স্ট্র্যাপ লাগানো। গলায় লাল-রঙা

মাফলার। এদিকে জামার বুকের সব কটা বোতাম খোলা। মাথায় একটা সাদা খদ্দরের গান্ধীটুপি।

অবাক হয়ে ওরা দুজনে ভদ্রলোকের আপাদ-মস্তক টর্চ ফেলে নিরীক্ষা করতে লাগল।

কি হল? অত দেখার কি আছে? বলুন না? আপনারা কি ইনকামট্যাক্সের লোক?

বিষাদ বলল, ইনকামট্যাক্সের লোককে ত কারোই পছন্দ নয়,আপনার দেখছি তাদের খুবই পছন্দ। তবে, আমরা ইনকামট্যাক্সের লোক নই। বুঝলেন, আমরা অন্যলোক।

ও, নন। তাহলে...

হতাশ গলায় বললেন ভদ্রলোক।

আমি আসছি ঘাঁতির রাজবাড়ি থেকে।

আপনি রাজার কে হন?

রাজা আমার পিসতুতো বোনের জামাইবাবু হন। ওখানে বেড়াতে এসেছি।

আপনি কি এই পোশাকেই সবসময় থাকেন?

হ্যাঁ।

কি করেন আপনি?

আমি গায়নাকোলজিস্ট। সবসময়েই তৈরী হয়ে থাকি। কে জানে। কখন ডাক আসে? আরে! মেলা ভ্যাচর ভ্যাচর করেন দেখি আপনারা। ইনকামট্যাক্সের বাবুদের জন্যে একটি চিঠি আছে।

আপনি এগিয়ে যান বাংলোতে। সেখানে হয়ত তাঁরা আছেন। গিয়ে ওঁদেরই বলুন, যা বলার।

ভদ্রলোক বললেন, আরও একটা চিঠিও আছে।

কে দিয়েছেন?

কাকে দিয়েছেন?

তা জানি না।

নাম লেখা নেই?

দেখিনি দাদা।

যটা চিঠিই থাক, ওঁদেরই গিয়ে দিন। ওঁরা খুলে দেখবেন।

আচ্ছা। এগোই। ঠাণ্ডায় নাকটা গলে গেছে। সামনেই নদী ত। এ ঠাণ্ডার রকমই অন্য। ঘাঁতিতে কিন্তু এমন নাক-গলানো শীত নেই।

ভদ্রলোক, বাইকটি স্টার্ট করেই শুধোলেন, আর কতটা যেতে হবে?

ঐ তো। সামনেই, বাঁয়ে ঘুরলেই, দেখতে পাবেন আলো। হ্যাজাক জ্বলছে।

আচ্ছা। নমস্কার দাদারা। আপনাদের পরিচয়টা জানা হল না?

বিষাদ বলল, আমরা মানুষ, তবে পুরুষ। আপনার পেশেন্ট হব না কখনও।

ভদ্রলোক ওদের পায়ের দিকে চাইলেন, যেন দেখার জন্যে ; বিষাদদের গোড়ালিগুলো উল্টোদিকে কিনা, ভূতেদের যেমন হয় বলে শোনা যায় আর কী। তারপর বললেন, আপনারা হেঁয়ালি করবেন না স্যার। সত্যি বলছি। একে নাক গলে গেছে।

বলেই, বললেন, দাদাদের পরিচয়টা? পূর্ণ পরিচয়?

আমি পূর্ণ।

পূর্ণ বলল।

বিষাদ বলল, আজ্ঞে, আমাদের আর কোনই পরিচয় নেই।

পূর্ণ বলল, আমরা লেজ মাত্র। মাথা নই।

লেজ, লেজ ; লেজ? ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

বলতে বলতে, ভদ্রলোক হাতের অ্যাকসিলারেটরটা চাপ দিয়ে ঘোরালেন। মোটর বাইক এগিয়ে গেল ভট্ ভট্ ভট্ শব্দ করে।

বিষাদ বলল, প্রত্যেক মানুষকেই ঈশ্বর অরিজিনাল করে বানিয়েছেন। কেউ নয় কারো মতন। তাই না? একটা টাইপ-ক্যারেকটার।

ঠিকই বলেছিস। তবে ব্যতিক্রমও আছে।

পূর্ণ কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারেনি জগমগিকে যে, সে বায়না নিয়ে.......বাংলোতে সত্যিই যাবে বলেছিল কি না।

জিজ্ঞেস করতে পারেনি নাথুদাকেও।

জগমগিকে কোনরকম সন্দেহই সে করতে পারবে না। নিজের চোখে দেখলেও না।

বাংলোতে যাননি বটে আই এ সি সাহেব কিন্তু পরদিন সার্কিট-হাউসে ফিরে এসে ছিলেন ঘাঁতি থেকে। সেখানে এক ঘটনা ঘটেছে নতুনরকম।

আই. এ. সি ভদ্রলোক বেজায় মোটা। গাড়িতে, ঘাঁতি অবধি গিয়েই তাঁর প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল গায়ে, হাতে ; পায়ে। তার উপরে, ঘাঁতির জমিদার, ভয়ও দেখিয়ে দিয়েছিলেন শীত এবং রাঠৌড়ের জঙ্গলের। ঐ বাংলোর সুখস্বাচ্ছন্দের অভাবের। আরও বলেছিলেন যে, পাখি-ফাখি নেই। খামোখা ঐ উদোম জায়গার ছোট বাংলাতে গিয়ে কষ্ট করবেন কেন? খাওয়ার দাওয়ার যাতে কষ্ট না হয় এবং যাঁরা আছেন তাঁদেরও কষ্ট না হয়, সে জন্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি। আজ্ঞা করুন, আপনার ডিনার এখানে আপনার হুকুম মত, মনোমত, বানিয়ে দিচ্ছি। তারপর রাতটা এখানে থেকে যান। ভাল হুইস্কি আছে। নাচগান-এর সখ থাকে ত তাও বলুন। সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমরাও ত রাঠৌড়। বাংলাতে থাকতে থাকতে বাঙালী বনে গেছি। তবে পুরানা জমানার কিছু কিছু পুরানা অভ্যেস ত রয়েই গেছে।

বলে, আতরদান খুলে আই. এ. সি সাহেবকে আতর মাখালেন।

নসু মোক্তারের বরাত খারাপ, নইলে, তাঁর নতুন ল্যান্ডমাস্টারে তিরিশ মাইল

আসতে তিনবার টায়ার পাংচার হবে কেন। আর ঐ যে দেরীটা হল, তাতেই ঘোষাকির পুরনো মক্কেল রাজাবাবু তাঁর কপালটা পোড়ালেন। আই. এ. সি, সাহেবও তেমন লোক। পাখি মারার জন্যে এত আয়োজন, এত হাঙ্গামা ; আর রাজবাড়িতেই রয়ে গেলেন।

রাজাবাবু, নসুবাবু আসার আগেই বলে রেখেছিলেন আই. এ. সিকে যে, পাখি শিকার করলেও নিজে স্যার আর কতটুকু খাবেন? কলকাতাতে গিয়ে ফ্যামিলির সঙ্গে না খাবেন? শ্বশুরবাড়িতেও ত পাঠাবেন? তবে? আপনি ট্রেনের কামরাতে ওঠার আগে, আমার শিকারীকে দিয়ে হাতে-গরম পাখি মারিয়ে আপনার কম্পার্টমেন্টে তুলে দেব। দেখবেন, কেমন অ্যাপ্রিসিয়েট করেন সকলে। রোস্ট করবেন হাঁস আর কাদাখোঁচার।

সাহেব একটু ভীতু এবং সিদ্ধান্ত নিতে দোনামনা করেন।

হনুমানলাল এর রেজিস্ট্রেশানের কি হবে, কে জানে! যাই হোক, তিনি যে কোনো কারণেই হোক, গেলেন না বাংলোয় আর সেজন্যে অতজন লোকের কি হয়রানি।

নসু মোক্তার পূর্ণকে বলেছিলেন, পরে ; এসব আসলে ঘোষাকিরই ....ষড়যন্ত্র। নষ্টামি। ঘাঁতির রাজা ঘোষাকির পুরনো মক্কেল। নিশ্চয়ই গোপিনাথপুর থেকে ফোন করে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, শুধু এক কাপ চা খাবার। আই. এ. সিকে সেই ওখানে বিশ্রাম করার কথা বলেছিল। আর রাজাও ঘোষাকির প্রম্পটিং মতন যা করার করে, নসু মোক্তারের ওপর টেক্কা মারল। ছি! কী অন্যায়।

নসু মোক্তার, দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, ঠিক আছে। এক মাঘে শীত যায় না। আমিও তক্কে তক্কে থাকব। সুযোগ মতন এমন টাইট দেব যে, বুঝবে বাছাধন।

পরদিন সার্কিট-হাউসে, রাত আটটা নাগাদ প্যানাকে নসু মোক্তার যেতে বলেছিলেন। গিয়েও ছিল প্যানা। তখন বাইরের লোক বিশেষ কেউই ছিল না। বড় হাকিম ছিলেন আর হরিষদা।

ঘরের মধ্যেই বসেছিলেন সকলে। আর সাহেব, তাঁর ময়দার বস্তার মতন বপু নিয়ে, খাটের উপরে, মশারীর মধ্যে, আধশোয়া হয়ে বসে ছিলেন লেপে পা মুড়ে। গোপিনাথপুরের মশা নোটোরিয়াস। হাতে একটা গ্লাস। তাতে, হালকা হলুদরঙা পানীয়। সোডা মেশানো। বুড়বুড়ি উঠছিল।

পরে জেনেছিল পূর্ণ, হরিষদাদার কাছে যে ; তাকে বলে, হুইস্কি—সোডা।

হঠাৎ নসু মোক্তার বললেন, এই যে, এসে গেছো প্যানা! তোমার কথাই

বলছিলাম সাহেবকে। তোমার মত ভাল পা টিপতে এ অঞ্চলে আর একজনও পারে না। আর স্যারের পায়ে বড়ই ব্যথা হয়েছে। বাত আছে। অমাবস্যাতে বেড়েছে আরও। একটু ভাল করে আধঘন্টাটাক সাহেবের পাটা টিপে দাও ত লক্ষ্মী ছেলে।

কথাটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারেনি পূর্ণ। ভেবেছিল, কোনো ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে বুঝি।

এই ছেলেটি কে?

সাহেব বললেন।

এ আমার মুহুরী স্যার। খুব ফাল ফ্যামিলির ছেলে। কাকারা সব সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছিল বাবা মারা যাবার পরে। হাজারীবাগের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশুনো করেছে অথচ গ্র্যাজুয়েশন করতে পারেনি। তাই আমার মুহুরীগিরি করছে।

তা আপনিই বা ওকে ছুটি দিয়ে বি.কম আর ল'টা পাশ করতে দিচ্ছেন না কেন?

আমি ত সবসময়েই বলি স্যার। ও সময়ই করে উঠতে পারে না।

নাম কি ভাই, তোমার?

সাহেব শুধোলেন।

পূর্ণ রায়।

বাঃ!

কি হল প্যানা? দেরী কোরো না। শুরু কর।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটলেও কেউ কথা বলত না কোন, এমনই নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন সকলে। এদিকে প্যানাকেও থাকতে হবেই সেখানে, কিছুটা নিজেরই উৎসাহে। কারণ, জগমগি এখানেও ত আসতে পারে, যদি আসার হয়। ব্যাপারটার সত্যটা যাচাইও হয়ে যাবে। শেষটা দেখে যেতে চায় ও।

নিজের বাবাকে হারিয়েছে প্রথম যৌবনে। বাবা মা কারওই পা টেপেনি জন্মে। অন্য কারোও নয়। তাছাড়া, এই ময়দার বস্তা, নসু মোক্তারের বা হরিষদা বা বড় হাকিম ছোট হাকিমদেরই পূজ্য। পূর্ণর কি? প্যানা কেন পা টিপতে যাবে?

কিন্তু ওর স্বভাব বড় কোমল। আর, আই. এ. সি. সাহেবও ওর দিকে এমনভাবে চেয়েছিলেন যে বাৎসল্যরূপ দেখতে পেল প্যানা। কী যে হয়ে গেল, কোনোদিন যা করেনি প্যানা, তাই করল। ফর্সা-ফর্সা, গোদা-গোদা নরম পা, গোড়ালি থেকে উরু; আধঘন্টা ধরে টিপে দিল।

সাহেব বললেন, বেঁচে থাকো বাবা। তোমার কথাই বলছিলেন এতক্ষণ ওঁরা সকলেই। আমার জন্যে অনেক কষ্ট হয়েছিল সেদিন তোমাদের প্রত্যেকেরই। আসলে, রাজা সাহেব এমন সব বললেন। আমি কি আর জানি তার পেছনে অন্য ব্যাপার আছে।

যতক্ষণ থাকল পূর্ণ, দেখল, বুঝল যে ; সব বাবারই বাবা থাকে। হরিষদাদের বাবা বড় হাকিম। বড় হাকিমের বাবা আই. এ. সি। আই. এ. সির বাবা সি. আই. টি। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নয়, কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স।

দেখে, আনন্দ হল যে, নসু মোক্তার বড় হাকিমের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন, হুজুর হুজুর করেন ; বড় হাকিমও আই. এ. সির সঙ্গে ঠিক তেমনই ব্যবহার করছিলেন।

পা ত সেদিন টিপে দিয়ে চলে এল পূর্ণ। কিন্তু পরের সোমবার অফিস খুললে ইনকামট্যাক্স অফিসের সব লোক ওর গায়ে থুথু দিতে লাগল। ঘোষাকির কর্মচারীরা থেকে, যে ছেলেটার চায়ের দোকান, গেটের বাইরে ; সেও। নসু মোক্তার শুধু বড় হাকিমকে বললেন, যে, দেখলেন ত স্যার। বস-এর প্রতি যদি অন্ধ ভক্তি থাকে তবেই কর্মচারীরা এমন বশংবদ হয়।

যতই বেলা বাড়তে লাগল, ততই সরল পূর্ণ বুঝতে লাগল যে ; যে-কাজটা নসু মোক্তার তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন তাতে নসু মোক্তারের ইজ্জৎ বেড়েছে এবং তার নিজের ইজ্জৎ ধুলোয় লুটিয়েছে।

ক'টা টাকা মাইনের জন্যে, এত খাটনির উপরে এই অপমানটা ; তার হঠাৎ করে গায়ে লেগে গেল। হঠাৎ করে নয়। কালিপুজোর দিনে কুকুরের লেজে তারাবাতি বেঁধে, তা জ্বেলে দিয়ে, ছেলেরা যেমন তার পেছনে পেছনে দৌড়য়; সারা অফিসের স্টাফ, উকিলেরা, উকিলদের স্টাফ। এমন কি মক্কেল ও মুহুরীরা পর্যন্ত ফিক ফিক করে হাসতে লাগল তাকে দেখে।

বেলা চারটে নাগাদ অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের, ভদ্র, সভ্য, বিনয়ী পূর্ণ, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন ছিটকে উঠে, নসু মোক্তারের দেওয়া সাইকেলটা এক ধাক্কায় সিঁড়ির ওপরে ঝনঝনিয়ে ফেলে দিয়ে, সকলের সামনেই নসু মোক্তারকে বলল, আমার হিসেব মিটিয়ে দেবেন আজই। আমি সেরেস্তাতে আসব সাতটার সময়ে।

হতভম্ব নসু মোক্তার পিছু ডাকলেন, প্যানা, প্যানা ; বাবা পূর্ণ।

কিন্তু পূর্ণ কোনদিকে না চেয়ে চটি ফটফটিয়ে হেমন্তর রোদের মধ্যে, কাঁধের উপরে শেয়াল-রঙা আলোয়ানটাকে ফেলে, হন হন করে বেরিয়ে গেল।

নসু মোক্তার, বড় হাকিমের ঘরে ঢুকে এসে বললেন, এগজামিনেশান আজ

এই অবধিই থাক স্যার। বাকিটা কাল করা যাবে।

কাজটা আপনি ভাল করেননি নসুবাবু। পা টেপবার লোকের কি অভাব ছিল? ছকু খানসামার তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেটাকে, সার্কিট-হাউসের দারোয়ানের শালাকে বললেও, তারা টিপে দিত। পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলে, খুশিতে ফেটে পড়ত। তা নয়, আপনি রেসপেক্টেবল ফ্যামিলির ভাল ছেলেটাকে দিয়ে....।

এত বাড়াবাড়ি করার দরকার কি ছিল?

তাছাড়া, পূর্ণর মতন ইংরিজি আই. এ. সি সাহেব নিজেও লিখতে পারেন না। যতদিন দেশে ইংরিজির কদর আছে, পূর্ণর চাকরীর অভাব হবে না। ও নেহাতই বোকা বলে, এতবছর আপনার মুহুরীগিরি করে যাচ্ছে। ওকে সুবুদ্ধি দেবার মত কেউ ত ছিল না। আপনিই দিতে পারতেন। যেখানে আপনাদের ছাড়াছাড়িটা হতে পারত ভালবাসার সঙ্গে, সেখানে সেটা হল এমন করে। এটাই দুঃখের।

নসু মোক্তার বললেন, কিচ্ছু হয়নি স্যার। দেখবেন, কাল ওই এসে খাতা দেখানোর যেটুকু বাকি আছে তা সম্পূর্ণ করবে। ছেলেমানুষ। তায় এত লোকে উত্যক্ত করছে, খেপাচ্ছে ; সব শালা আমার শত্রু ত। তা ও কি করবে? মাথা গরম করে ফেলেছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার সন্দেহ আছে।

বড় হাকিম বললেন।

তারপর বললেন, ওর দিক দিয়ে ভালই হল। ও এবারে নিজেকে আবিষ্কার করবে। ডিসকভারি অফ পূর্ণ রায়, বাই পূর্ণ রায় হিমসেল্‌ফ।

বড় হাকিম যা বলেছিলেন, তাই হয়েছিল।

পূর্ণ হিসেব নিতেও যায়নি। নসু মোক্তারই তার গাড়ি হাঁকিয়ে পূর্ণর পর্ণ কুটিরে এসেছিলেন। উনি ঘুঘু মাল। পূর্ণর মুড দেখে, কথা না-বাড়িয়ে একটি খাম এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটি হিসেব নয়। তোমার মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য বনফুল তেল।

খামে, দশটি একশ টাকার নোট আগেই ভরে এনেছিলেন। হাজার টাকা।

তারপর বলেছিলেন, কালকে সকালে সময়মত এসো সেরেস্তাতে বাবা। তোমার জন্যে নতুন ঝিং-চ্যাক ভাল সাইকেল আজই আনতে দিয়েছি। কাল সকালে তুমি আসার আগেই এসে যাবে। ব্যাটারী-অপারেটেড হেড লাইট, ক্যারিয়ার, সামনে-হ্যান্ডল এর সঙ্গে লাগানো বেতের বাস্কেট, টেইল লাইট সব আছে। মাথা গরম কোরোনা বাবা। এই আমি কান ধরছি বাবা। অপরাধ মার্জনা

করে দিও। কিছু ভেবে করিনি, যা করেছি।

বলে, নিজে হাঁটু গেঁড়ে মেঝেতে বসে দু'কানে হাত দিলেন।

জগমগি তখন পূর্ণর ঘরেই ছিল। দরজা খোলা থাকায়, অন্যান্য ঘরের অনেকেই নসু মোক্তারের কান-মলা খাওয়াটা দেখল।

কানে হাত দিয়েই, নসু মোক্তার চলে গেছিলেন।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন তিনি। মনে মনে বললেন, টাকার চেয়ে বড় সওয়াল আর কিছু নেই। ও আসবে না, ওর মরা-বাপ আসবে। মেয়েদের মতন ছেনালি ভাল লাগে না।

জগমগি বলল, কত দিলেন ওকিল সাব?

জানি না।

বলে, খামটা জগমগির দিকে ছুঁড়ে দিল প্যানা।

জগমগি নিরাসক্তভাবে খুলে দেখে বলল, বাবাঃ। এ যে অনেক টাকা। তোমার ইজ্জতেরত অনেকই দাম।

হঠাৎই মাথাতে রক্ত চড়ে গেল প্যানার। কী যে হচ্ছে বারবার।

বলল, মুখ সামলে কথা বল বাঈজীর মেয়ে। তোমার ইজ্জতের দাম কত?

জগমগির সুন্দর মুখটা হঠাৎ কালো হয়েগেল।

দেখে মনে হল, ও এখুনি কেঁদে ফেলবে।

কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, আমি আমার ইজ্জৎ বিকোই না। এর হাজার গুণ দাম কেউ দিলেও বিকোতাম না। যে-ইজ্জৎ বিকিয়েই গেছে একবার, তার দাম কে কত দিল তাতে কিই বা এসে গেল। নতুন করে বিকোবে না আর।

বলেই বলল, তুমি একটা হাঁদা। টাকাটা, নসু মোক্তারের মুখে ছুঁড়ে মারতে পারলে না? এখন আমার উপরে রাগ করলে কি হবে?

পূর্ণ, তখনও রাগে গনগন করছিল, ও বলল একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সত্যি বলবে?

পূর্ণ দৃষ্টিতে, জগমগি, পূর্ণর দুচোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপরে, চোখ নামিয়ে বলল, কি কথা বলবে? বল?

তুমি কি হাজার টাকা নিয়েছিলে, কোনো বাংলোতে গিয়ে নাচ-গান করবে বলে? এবং... হাজার টাকা আগাম। পরে আরও হাজার টাকা পাবে, এমন কড়ারে?

জগমগি কথাটা শুনে মাথা ঘুরে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

সামলে নিয়ে, তার ডান হাঁটুর উপরে কনুই রেখে ; যেমন করে, তানপুরা

ছাড়ার সময়ে কেউ রাখে, নিজের ডান হাতের পাতা দিয়ে নিজের ডান গালটি পুরো ঢেকে, এক দৃষ্টিতে পূর্ণর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু কথা বলল না কোন।

কি? জবাব দাও?

পূর্ণ বলল, মুখে ঘৃণা মিশিয়ে।

জগমগি বলল, তুমি একটা হাঁদারাম। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হাঁদা।

বাজে কথা বলে কি লাভ? জবাব দাও।

তোমাকে কেউ কি বলেছে যে, আমিই নিয়েছি টাকাটা? কে বলেছে?

তুমি নাওনি। নাথুদা নিয়েছে। কে বলেছে, তার নাম এখন জানবার দরকার নেই।

নাথুদা নিয়েছে?

অবিশ্বাসী গলাতে বলল, জগমগি।

হ্যাঁ। তাই ত বলল। সেও নাকি তোমার সঙ্গে যেত। মানে, নাথুদাও।

নাথুদাও সঙ্গে যেত, আমি যেখানে মুজরা করতে যেতাম সেখানে? তুমি এ কথা বিশ্বাস করলে?

এই কথাকটি বলার সময়ে, জগমগির মুখে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল।

তা আমি কি করে জানব, সত্যি মিথ্যা। শুনেছি যখন ভাল লোকের কাছ থেকে, তখন ব্যাপারটা আমার জানা দরকার।

কেন জানা দরকার? জানার কি আছে? আমি ত খারাপ মেয়েই! এ ত তোমার জানাই আছে। আমি যদি মুজরো নিয়ে কোথাও যাইও, তাতে তোমার অবিশ্বাস বা আপত্তিরই বা কি থাকতে পারে? আমি তোমার কে?

তুমি আমার কেউই নও। কিন্তু আমি জানি যে, তুমি খারাপ নও।

হাসল, জগমগি পূর্ণর কথা শুনে। ভারী সুন্দর দেখাল তখন ওকে।

বলল, কি করে জানলে?

জানি।

খুউব জানো। বাঈজীর বাড়িতে মানুষ পনেরো বছর বয়সে ঘর ছাড়লাম সারেঙ্গীওলার সঙ্গে, আর আমি হলাম গিয়ে সতী।

হ্যাঁ তুমি সতীই। কথা বাড়িও না। প্রশ্নটার জবাব চাই আমি।

বাঃ রে। কিসের জোর তোমার, আমার উপরে?

জবাব চাই।

জবাব তোমাকে আজ আমি দেব না।

কেন? দেবেনা কেন?

দেব না এই জন্যে যে, এখন দিলে যে জবাব দেব ; তা তোমার মনপসন্দ হবে না। তুমি যে মনপসন্দ জবাব চাও।

নাথুদা কোথায়? দেখছি না যে।

তার দাদ্দা আবার এসেছে পড়শু। তুমি ত ছিলে না। তাকে নিয়ে বেরিয়েছে। আজ ডিউটি নেই?

না। ছুটি নিয়েছে তিনদিন।

কবে থেকে?

তুমি যেদিন চলে গেলে, সেদিন থেকেই।

ও।

সন্দেহের মেঘ ঘনাল পূর্ণর মুখে।

আমার উপরে রাগ কোরো না জগমগি। আমার একজনও, কেউই নেই, এই সংসারে। তুমিই....। তাই ভুল করে জোর করি। আমি একটা ছাগল। তুমিই....

আমি কি?

লণ্ঠনের আলোতে জগমগির দুচোখে এক আকুল প্রশ্ন থরথর করে কেঁপে উঠেই, শরতের শিউলির মতন ঝরে গেল।

তুমি....। তুমি জানো যে, আমার কেউ নেই। কেউই নেই। তুমিও ত আমার কেউ নও। তুমি ত নাথুদারই।

হুঁ।

জগমগি বলল।

তারপর বলল, এই সংসারে কেউই কারো নয়। যে যাকে তার করে নেয়, সেই তার। নাথুদার সঙ্গে আমার কিসের রিস্তা? একঘরে শোওয়া ছাড়া? আর সেই শোওয়াটা কেমন, তাও যদি কেউ দেখতে পেত? তবে, মানুষটার বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই। আমি অকৃতজ্ঞ নই। দুর্দিনে সেই আমার সহায় হয়েছিল। মুসলমান বাঈজীকে আশ্রয় দেওয়াতে, তাকে তার গ্রাম চিরদিনের মতন ছেড়ে দিতে হয়েছে। চাকরী পেয়ে এসেছিল যদিও। কিন্তু ফিরে ত যেতে পারেনি আর। এই এক ঘরে বন্দী রয়েছে আমার সঙ্গে। আত্মীয় পরিজন সবই ছেড়েছে। আমার জন্যে। অথচ আমি...। তার আত্মীয়রা যখন আসে দেশ থেকে; যখন হিন্দীতে লেখা চিঠি আসে, তখন সে আজকাল কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। আমি যে তার বোঝা, তার স্বাভাবিক জীবনের পথে, তার পুনর্মিলনের পথে আমিই যে একমাত্র বাধা, তা বুঝতে পাই আজকাল। অথচ আমার জীবনও ত

মরুভূমিই। শরীর বা মন সবই ত আমার উপোসী। এই মিথ্যে বড়ত্ব নিয়ে, এই মিথ্যে মহত্ত্ব নিয়ে দিনের পর দিন কাটানো বড় অহেতুক বলে মনে হয়। মানুষটাকেও মুক্তি দিতে চাই আমি। তার মহত্ত্ব, পাখির পায়ের আঠারই মত তাকে আমার সঙ্গে একই দাঁড়ে বসিয়ে রেখেছে তিন বছর। বড় কষ্ট মানুষটার। আমার বড় লজ্জা হয়।

তাই?

অবাক হয়ে, ওর চোখে চেয়ে বলল ; পূর্ণ।

তাই।

তারপর বলল, আমি অনেকই দিন থেকে ভাবছি যে, শুধু হারমনিয়মটা নিয়েই একদিন ভোরের আজানের আগে, ওকে মুক্ত করে দিয়ে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

যাওয়ার জায়গা ত কোনো নেই। পথ থেকে এসেছিলাম, পথেই গিয়ে দাঁড়াব।

তারপর?

তারপর, পথ যেখানে নিয়ে যাবে। পাটনা থেকে ত পথেই নেমেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে জগমগি বলল, তোমরা একটা কথা বল না? "পথে এসো।" সেই পথ হচ্ছে সুপথ। আমি ত সুপথে নামিনি। বিপথেও নয়। কুপথে নেমেছিলাম। তাই আমার শেষ যাত্রাও সেই পথেই হবে।

আমারও খুব ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে।

পূর্ণ বলল, আবেগভরা গলায়।

ওকে উত্তেজিত দেখাল। ওর ছায়াটা কেঁপে উঠল ওর পেছনের দেওয়ালে।

কোথায় পালাবে?

পথ যেখানে নিয়ে যায়। এই ইনকাম-ট্যাক্স, জাবদা, খতিয়ান, এই রেওয়া-মিল, এই মিথ্যে ট্যাক্স-কমানোর আর ফাঁকি দেওয়ার ব্যূহর মধ্যে নইলে আমি সারাজীবন বদ্ধ হয়ে যাব। গোলোক-ধাঁধায় আটকে থাকব, যা থেকে আর মুক্তির কোন উপায়ই থাকবে না। কোন উপায়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, জানো, রোজই অনেক মানুষকে দেখি ইনকামট্যাক্সে, যাঁরা, কেন যে মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন ; তাই ভুলে গেছেন। চুল পেকে গেছে, টাক পড়ে গেছে, সকাল থেকে রাত, রাত থেকে দিন এই টাকা-কামানো আর টাকা-বাঁচানোর গহ্বরে পড়ে রয়েছেন।

কি করবে?

ভাবছি। তোমার সঙ্গে হারমনিয়ম বাজালে কেমন হয় বলো ত?

হেসে উঠল জগমগি, বিমল আনন্দে।

বলল, হারমনিয়ম বাজাবে কোন দুঃখে। তোমার গলাতে খুদার কুদরতে এমন জুয়ারি। তুমিই গাইবে। আমি হারমনিয়ম বাজাব তোমার সঙ্গে। রেল-স্টেশানে, মেলাতে, হাটে, যা পাব ; তাতেই দুটি পেট চলে যাবে।

সত্যি বলছ? পালাতে চাও তুমি?

কবেই পালিয়ে যেতাম।

যাওনি কেন?

একা যেতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া বলেইছি ত। ঐ ভাল মানুষটাকে মনে মনে তৈরী না-করিয়ে দিয়ে পালালে, খুদাহ ক্ষমা করতেন না আমাকে।

একা যেতে ইচ্ছে করছিল না? ত দোকা কোথায় পেতে?

দোকা ত ছিল হাতেরই কাছে। তুমি।

আমি? কই? কিন্তু তুমি ত বলোনি কখনও কিছু। আভাসে-ইঙ্গিতেও বলো নি।

পূর্ণ বলল।

বলেছি। তুমি দেখতে পাওনি। শুনতে পাওনি। কিছু কথা যাকে, যা চেঁচিয়ে বললেও, যাকে তা বলা হচ্ছে সে শুনতে পায় না, শোনার শুভক্ষণটি না এলে।

তুমি জানতে যে, একদিন বলব এবং এমন করে বলব যে, তুমি শুনতে পাবে। তাছাড়া....

তাছাড়া কি?

তাছাড়া, ছেলেরাই ত আগে বলে এসব কথা। না, কি?

তা বলে।

বলে, হাসল পূর্ণ।

তারপর বলল, আমি যে আসলে ছেলেই নই। ছেলে হলে, পুরুষ হলে ; কি রাধানগরের সাপুইরা, গণপতিপুরের নসু মোক্তার আমাকে এই এমন করে নিংড়ে নিতে পারে? অতীত-ভবিষ্যৎ সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে? পা টেপাতে পারে আমাকে দিয়ে আই. এ. সির? আজকে ইনকামট্যাক্স অফিসে যে কী অপমান অসম্মান সইতে হয়েছে, সারাটা সকাল ; তা কি বলব। অথচ, আমি আমার নিজের কোন স্বার্থপূরণের জন্যে নিজেকে কখনওই এত ছোট করতাম না। তাছাড়া, এও বলব, সত্যিই বলছি, সেই আই. এ. সি ভদ্রলোক আমার বাবারই বয়সী। এবং আমাকে কিন্তু উনি ছেলের মতনই দেখেছেন, তেমন স্নেহের সঙ্গেই কথা

বলেছেন। ব্যাপারটার এমন কদর্য অর্থ যে কারা করল, কেন করল ; তা ভেবে পাচ্ছি না।

যা হয়েছে, তা ভালর জন্যেই হয়েছে। ওটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার বাবা থাকলে কি, পা টিপতাম না তাঁর? বল? টিপতাম ত! বাবা যে বুড়োই হয়নি। তাই, সেই মুহূর্তে নিজের মান অপমানের কথা ভাবিনি, নসু মোক্তারের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই যে ব্যাপারটা, তাও বুঝিনি ; ভেবেছিলাম, পা টিপতে কেমন লাগে একটু টিপেই দেখি না। বাবার পা ভেবেই টিপেছিলাম।

হেসে ফেলল জগমগি, পূর্ণর কথার ধরনে।

তারপর বলল, আমার বাবাকেও আমার মনে আছে। কিন্তু না থাকলেই খুশি হতাম। মার শরীর ভাঙিয়ে মদ খেতো বাবা।

একটু থেমে জগমগি বলল, তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ পূর্ণ দাদা।

পূর্ণ বলল, রবীন্দ্রনাথের কোন লেখাতে যেন পড়েছিলাম যে, মেয়েরা যাকে ভালবাসে, তাকে সবসময়েই ছেলেমানুষ ভাবে। ভালবাসার চোখ, ভালবাসার জনকে, কখনও সাবালক হতে দেয় না।

তাই?

জগমগি বলল।

বলেই বলল, তুমি কত পড়েছ।

পড়লে কি হবে? ছাপ নেই ত।

আমি তোমাকে ছাপ দিয়ে দেব। তোমার সর্বাঙ্গ রাঙিয়ে দেব আমার পেয়ারের দুলহারের ছাপে ছাপে। তারপরই, যেন হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, কিন্তু পালালে ; তোমার বইগুলোর কি হবে? এত বই, এত ক্যাসেট ; রেকর্ড।

সেও একটা কথা বটে! পালালে ত চুপি চুপিই পালাতে হবে। তাছাড়া, আজ অবধি যতটুকু পড়েছি, যতটুকু জেনেছি, সব কিছুকে মুছে ফেলে, এই ইনকামট্যাক্সের মুহুরীর জগত, এই হুরজাই খাতে, নাজাই খাতেকে পুরোপুরি মুছে ফেলে, নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। শ্লেট মুছে দেব। পারব না?

পারবে না কেন?

তুমি রাজী? এক বস্ত্রে ঘর ছাড়তে? জগমগি?

তুমি যা বলবে, তাতেই আমি রাজী। আমার আর কটা বস্ত্র? কিন্তু আমাকে কুড়িটা টাকা দিতে হবে। দেবে ত? পালাবার আগে?

পূর্ণ হেসে ফেলল। বলল, মাত্র কুড়ি টাকা? কেন? কি করবে?

নাথুদার কাছ থেকে গতবছরে ধার নিয়েছিলাম।

ধার কেন? স্বামীর কাছ থেকে কেউ ধার নেয়?

স্বামী ত নামেই। তাকে ত কোনোদিনও সে-চোখে দেখিনি। জোর জন্মাবার মতন গত ক'বছরে এমন কিছুই ঘটেনি যে, জোর করি। এটা ঠিক, সে আমাকে শাড়ি-জামা-শায়া খোলা অবস্থাতে দেখেছে। আমিও তাকে নাঙ্গা দেখেছি। ব্যসস ঐ পর্যন্তই। আর ত কিছু কোনদিনও হয়নি।

বল কি? পাঁচ পাঁচটা বছর...

হ্যাঁ। তাছাড়া মুনাব্বর আমার প্রথম যৌবনে, আমাকে শরীর সম্বন্ধে এমনই ভয় পাইয়ে দিয়ে গেছে যে ; ঠিকই করেছিলাম আমি, মন ছাড়া শরীর, এ জীবনে কাউকেই দেব না।

তাই?

হ্যাঁ। মনের মানুষ খুঁজে পেতে পেতে যে বুড়িই হতে বসলাম।

বুড়ি হতে এখনও দেরী আছে অনেক। অনেকই বাকি আছে সবকিছুর। কুড়িতে বুড়ি হতে চাও?

আমার বয়স বাইশ।

তবে ত বুড়িই।

এমন সময়ে দরজাতে নাথুদার গলা খাঁকারী শোনা গেল।

এসো নাথুদা।

পূর্ণ বলল।

না। আজ নয়। বড়ই থকে গেছি। বহুদূরে গেছিলাম আমার দাদার সঙ্গে। সেত আমার সবচেয়ে বড় দাদা। বুড়ো। মানে, প্রায় অথর্ব। তাকে গাড়কুগাঁও-এর বাসে তুলে দিয়ে, তবে এলাম।

আমি যাই।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, জগমগি।

তাড়া নেই কোনো। তুমি যতক্ষণ খুশি বসেই এসো। চাবিটা দাও শুধু ঘরের।

নাথুদাদা বলল।

খাবে না?

নাঃ। খেয়ে এসেছি, ছাতুর লিট্টি।

চলে যেতে যেতে শুধোলো, ঘরে জল তোলা আছে ত? না কি যাব ইঁদারাতে?

না, না। সরাই ভর্তি জল আছে।

সারারাত জল পিপাসাতে মরব আজ। ছাতুর লিট্টি খেতে ভাল ; কিন্তু এই

দোষ।

চল, আমিও যাই।

জগমগি বলল।

আহা। বললাম না, বসে যাও।

কেন?

কেন?

জগমগির প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে নাথুদা বলল, তোমাদের দুটিকে একসঙ্গে আমি ভারী সুন্দর দেখি।

ধ্যাত।

বলল, জগমগি। লজ্জা পেয়ে।

পূর্ণও লজ্জা পেল। কথাটার জন্যে ততটা নয়, যতটা, এই মানুষটাকেই সে সন্দেহ করেছিল বলে। সে অবশ্যই যাবে হরিষদাদার কাছে, কথাটা কে বলেছিল, তা জানতে। রিষাদের সঙ্গেও পরামর্শ করবে একটু।

চাবিটা নিয়ে, নাথুদা ছায়ার মতো উঠোনের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল, এই কথাটাই বলব বলব করছি অনেকই দিন ধরে, পূর্ণ এই ঘরে আসার পর থেকেই। কিন্তু বলার মওকা পাই নি। আজ বলে ফেলতে পেরে, ভারী ভাল লাগছে।

ওরা দুজনে দুজনের মুখে চেয়ে, মুখ নামিয়ে বসে রইল।

এতদিন ধরে দেখছে দুজনে দুজনকে, তবু এত কি যে দেখার আছে ভেবে পেল না।

পূর্ণ হাসল।

হাসছ কেন?

নাঃ।

বলল, পূর্ণ

মনে মনে বলল, এতদিন ত দুজনে দুজনের ছিল না ওরা।

মালিকানাবোধ না জন্মালে, ভালবাসা শিকড় পায় না। এতদিন দুজনেই দুজনের কাছে এজমালি সম্পত্তির মতনই ছিল। নিজস্ব নয় বলে, যত্ন করার সময় অথবা মনও হয়নি।

তাই, আজ তফাৎটা বুঝতে পারছে।

পাবলিক ... স্থাপিত-১৮১৭

এখন রাত কত কে জানে।

হাত ঘড়িটা বালিশের নীচে রেখে শোয় পূর্ণ। ভাঁজ করা আলোয়ানটার সঙ্গে। রাতে যখনই ঘুম ভাঙে টিক্-টিক্ টিক্-টিক্ শব্দ শুনতে পায় বালিশের তলা থেকে। জেনে, আশ্বস্ত হয় যে, এই নিঝুম কার্তিকের রাতের হিম-ঝরা পৃথিবীতে ও ছাড়াও আর কেউও বেঁচে আছে ; পথের উপরে কার্তিকের হিম-রাতে এক-জোড়া জোড়-লাগা কুকুর-কুকরী ছাড়া।

ও যেদিন মরে যাবে, ঘড়িটা সেদিনও টিকটিক করবে।

মানুষের এই অদূরদৃষ্টির কথা ভাবলেই পূর্ণর খারাপ লাগে।

মানুষ, জীব হিসেবে, কতখানি মূর্খ হলে সে তার নিজের সৃষ্টিকে নিজের চেয়েও বেশি আয়ু দিতে পারে ; তা ও ভেবে পায় না। কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য চিত্রকলার কথা আলাদা। সে সব ত অনন্ত কাল থাকবে বলেই তারা মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু খাট, চেয়ার, হামন-দিস্তা, শিল-নোড়া, চিরুনী, খড়ম এদেরও এমন অমরত্ব দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল, সত্যিই ভেবে পায় না ও।

এমন এমন হিমেল রাতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে, ভাবনাতে পায় পূর্ণকে। এই ভাবনার কোন মাথা-মুন্ডু নেই। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত থেকে, একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক ; গোপিনাথপুর থেকে হাজারীবাগ, হাজারীবাগ থেকে রাধানগর, সেখান থেকে অদেখা পাটনা, জগমগির শৈশবের জায়গা। মরে-যাওয়া বাবা মায়ের মুখ, তার ও জগমগির ভবিষ্যতের শিশু-কন্যার হাসি, শেষ বিকেলে, পথ-পাশের টেলিগ্রাফের তার ছেড়ে উড়ে যাওয়া ফিঙে, যার কালো ডানা বুলিয়ে সে পৃথিবীকে অন্ধকার করে দেয় ; এমনই কত

ছবি, কত ভাবনাই যে মনে আসে এলোমেলো, তা কী বলবে।

কিছুপর আবার নিজেই বুঝতে পারে যে, মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ বলেই পারে তার সব সৃষ্টির কাছে হাসিমুখে হেরে যেতে। কারণ, মানুষই জেনেছে, কোন প্রাণীই চিরদিন বাঁচে না। পাখি থেকে কুমীর বা কচ্ছপ বা হাতি বা ডাইনোসরস। বাঁচে না বলেই, মানুষের পরম প্রার্থনা অমর হবার। এবং সেই অমরত্ব শুধমাত্র সম্ভব তার সৃষ্টিরই মাধ্যমে।

তবু সে, সেই অমরত্বে খুশি না থেকে, নিজেও অমর হতে চায়! আশ্চর্য।

একটা ছুঁচো চিক করে, চমকে দিয়ে, ডেকে উঠল, পায়ের দিকে। বাইরে থেকে গর্ত করেছে একটা সম্ভবত দরজার চৌকাঠের ওপাশে বা এপাশে। কোন দিন নাকটাই হয়ত কামড়ে নিয়ে চলে যাবে।

হঠাৎই মনে হল পূর্ণর, পুরুষের শরীরে নাকের চেয়েও নরমতর স্থানও ত কিছু আছে। যেমন কান এবং অন্যতর কিছু। খেয়ে গেলেই গেল। নাক তাও প্লাস্টিক সার্জারী করে মেরামত করা যাবে, কিন্তু নরমতর কোন কিছু গেলে কি হবে, কে জানে। পৃথিবীর কোন দোকানে স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায় বলেও ত জানা নেই।

মাঝ রাতে, একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর ঘুমই আসতে চায়না ওর।

নাকে, জগমগির শরীরের সেই গন্ধটা পাচ্ছিল। কি মেখেছিল, জগমগি, কে জানে। বোধহয় সস্তার আতর হবে। দামী আতর আর ও কোথা থেকে পাবে? জগমগির চোখের উজ্জ্বলতা, স্বভাবের উচ্ছলতা, ওর গলার রিনরিনে সুবাস, সমানে সমানে সমস্ত স্বরে, কোমল রেখাব আর গান্ধারে আনাগোনা-করা স্বরে, সে পরিযায়ী পাখির মত কথা কয়। সুরের যাদু পূর্ণকে চিরদিনই মোহিত করেছে কিন্তু আজ রাতের মোহিত করার রকমটা পুরোপুরিই আলাদা। জলোচ্ছ্বাসের শব্দ পাচ্ছে কানে এখন ও। সমুদ্রের। নোনা-গন্ধ নদী এবারে সাগরের কাছে এসে পড়েছে, খুব কাছে। এবারে সঙ্গম হবে।

হবে কি?

কী যে সব উল্টোপাল্টা ভাবছে!

কে নদী, কে সমুদ্র, তা পূর্ণ জানে না। যার নাম পূর্ণ, সমুদ্র ত তারই হওয়ার কথা। কিন্তু কথামত সব কিছু ত হয় না। হওয়া হয়ত উচিতও নয়।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল জগমগি।

শোওয়ার সময়ে ও কোনদিনও কিছুই পরে থাকে না শরীরে। এই তার

শিশুকালের অভ্যেস। গ্রীষ্মে পাতলা চাদর দেয় গায়ের উপরে ; শীতে রজাই। দিনান্তে, প্রতিরাতে, একবার সে তার শরীরকে নিজের নিভৃত আঙুল বুলিয়ে পরশ করে। এই তার অনেক কষ্টের জীবনে, দিনান্তের একটু ভালবাসা। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেই সব কিছু মহার্ঘ্য মনি-রত্ন, সে সহজেই বিলিয়ে দিতে পারত, সাধারণত্বের দীনতায়, অপমানে অপমানিত করতে পারত, কিন্তু করেনি। পারেনি। অথচ ভালবাসা ছাড়া কি মানুষে বাঁচে? গাছই বাঁচে না, তা মানুষ বাঁচবে কি করে? তাই, নিজেই নিজেকে আদরের হাত বুলোয়, ভালবেসে।

জগমগির মা বলত, ধৈর্য। ধৈর্য!

ধৈর্য ছাড়া কিছুই হয় না। না হয় ; পাওয়ার মতন কিছু পাওয়া ; না হয়, কদর দেওয়ার মতন কিছু দেওয়া। মাঝে মাঝে মায়ের মুখটা মনে পড়ে জগমগির। মনে পড়ে গিয়ে, ভারী কান্না পায়। কেমন আছে মা, কে জানে। বেচারী মা!

বিকেল থেকে সাজে বসত মা। রাবেয়া, মায়ের আয়া, তাকে সাজাতে বসত। গালচের উপরে ফুল, ঈত্বরদান, আরও কতকিছু নিয়ে।

আতর, সুর্মা, ফুল, জড়ি, গুলাবজল, হিনা, মেহেন্দী, মিষ্টি গন্ধের নানারকম মাথার তেল দিয়ে মার সাজ শেষ হতে লাগত পাক্কা দুঘন্টা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ। শরীরের কোন জায়গাই আর সুগন্ধিহীন থাকত না। বাইরের পাথর-বাঁধানো পথে নানারকম ঘোড়ার গাড়ির ঘন্টার আওয়াজ, ঘোড়ার পায়ের খটাখট, সহিসের চাবুকের শিস, ফুলওয়ালীর ডাক, আন্ডাওয়ালার হাঁক।

বেলা পড়ত, সন্ধে এগোত যত ; ভিতরে ভিতরে চাপা উত্তেজনা বাড়ত। সব ঘরে ঘরে।

একটা কথা ভেবে খুব অবাক লাগত জগমগির। ও ভাল করেই জানত যে, যে সাজ ; শেষ পরত অবধি খুলেই ফেলতে হবে অবশেষে, মেহমান-এর অঙুলি-হেলনে ; তাই পরবার জন্যে দুঘন্টা সময় কেন প্রতিদিন খরচ করত মা? তার চেয়ে, না-সাজাই ত ভাল ছিল। নগ্ন শরীরে বসেও ত গান যাওয়া যেত বা ফোয়ারার মতন হঠাৎ হঠাৎই উৎসারিত হয়ে উঠে নুপুর আর পায়েজোর পায়ে ঝুম-ঝুমিয়ে ঝনঝনিয়ে নেচেও ওঠা যেত।

একথা, মাকে একদিন বলাতে ; মা ওকে কাছে টেনে বলেছিলেন, আমার যা কিছুই আছে শরীরে, পৃথিবীর সব নারীর, ঘুঁটে কুড়োনী থেকে রানীরও আছে। কিন্তু আমার এমন কিছু আছে, যা ওদের কারোই নেই। নেই বলেই, নবাবজাদা থেকে আমীর ওমরাহ আমার কাছে ভীড় লাগায়।

সেটা কি?

তার নাম ছেনালি। এ অস্ত্রর ব্যবহার শুধু মেয়েরাই জানে। এ এক পরম দান।

পুরুষেরা, নিজেরা জানেই না, তাদের মারটা কোথায় পড়ে। তারা ভাবে, তারা সব জবরদস্ত জওয়ান। হাট্টাকাট্টা নরপাঠা। আসলে, ওদের মত কমজোর, নাজুক, বেবাক বুদ্ধু চিড়িয়া খুদা আর প্যায়দা করেননি। নারীর ছেনালি, পুরুষকে তপ্ত শলাকার মত বিদ্ধ করে। সে, তীরবিদ্ধ হরিণের মত থিতু হয়। পায়ে জোরও থাকে না যে, পালাবে। থাকে সবকিছুই সকলের, কিন্তু তাকে ঢেকে রাখতে, শুধু ঢেকে রাখতেই নয়, সুন্দর করে ঢেকে রাখতে কে কেমন জানে, তার উপরেই তার ইজ্জৎ-কদর। খুলতে লাগে পাঁচ মিনিট, ঢাকতে লাগে অনেক প্রহর। এই ঢাকা আর খোলা, এত সকলের জন্যেও, নয়!

তারপর উপমা দেবার চেষ্টা করে মা বলেছিল, বিরিয়ানি যে রাঁধে, সে রাঁধতেই জানে, বিরিয়ানি পরতে পরতে তুলে সে নিজে পরিবেশন করতে পারে না। "খনা পাকানা" এক জিনিস আর "খনা নিকালনা" আরেক জিনিস। সেই কারণেই, হাণ্ডি-নিকালনা আর বিরিয়ানা পাকানা, একই লোকের কাজ নয়। এদের তরিকার রকমই আলাদা আলাদা।

মা বলতেন, তাছাড়া, আসলে ব্যাপারটা কি জানিস জগমগি? যে-কোন কাজই হাজার রকম করে করা যায়। এবং ঠিক সেই জন্যেই একই কাজের হাজার রকম কিস্মত ধরা আছে দুনিয়াতে। তুই গানই গা, কী বিছানাতেই শো পরপুরুষের সঙ্গে ; অথবা যুদ্ধই কর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে, কিংবা খাজাঞ্চীই হ, এই সব শ্রেণীতেই হাজার রকম তনখা, দরমা, বকশিস, হাজার রকম নজরানা আছে যে, তা দেখতে পাবি।

সেদিন ছোট ছিল, ভাল করে বোঝেনি জগমগি।

আজ বোঝে যে, ব্যাপারটা আসলে ছিল উৎকর্ষর। মা যা বলতে চেয়েছিল তাকে, তা হচ্ছে যে ; যে কাজই করো না কেন, তা তোমার চেয়ে ভাল করে যেন আর কেউই না করতে পারে। এই জেদটুকু চাই। সে তুমি শরীরই বিকোও, কি জাহাজই চালাও। উৎকর্ষই হওয়া উচিত প্রত্যেক মানুষের পরম গন্তব্য।

যদিও হয় না।

মায়ের কথা মনে পড়ে গেলে একটি গানের কথাও মনে পড়ে গেল জগমগির।

মেহ্মান শেষরাতে চলে গেলে, ন'টা-দশটা অবধি ঘুমুত মা। তার পরে উঠে মিশি দিয়ে দাঁত মাজত। ভাল করে নাস্তা করত। খাস্তা, গরম গরম পরোটা, খাসীর কলিজা কষা, নয়ত মগজের কষা দিয়ে। রসুনের আঁচার ফলও খেত অনেক।

জগমগিকে বলত, বেশি করে ফল খা, ডাব খা। সুন্দরী, খালি বাহ্যিক প্রসাধনে হওয়া যায় না। সুন্দরী হতে হলে, এই সব নানারকম খাবার ছাড়াও আবার আত্মাকেও সুন্দর করতে হয়। ভাল ভাববি, ভাল করবি, কারো অনিষ্ট করবিনা, অমঙ্গল-চিন্তা করবি না। দেখবি, তোর মুখের মধ্যে আপনা থেকেই এক দারুণ সৌন্দর্য ফুটে উঠছে।

নাস্তা করার পর, মা রিওয়াজে বসতেন। রোজ। শুধু জুম্মাবার ছাড়া। জুম্মাবারে প্রত্যেক নামাজের সময়েই নামাজ অদা করতেন। এবং সেদিন মুজরো বসাতেন না। হিন্দু বাঈদের কাছে ভিড় লেগে থাকত সেই সন্ধেতে।

সকালের রিওয়াজের সময়ে ত রাগ-রাগিনীর যথার্থ সময়কাল বিচার করে গাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, দুপুর বিকেল সন্ধে ও মধ্যরাতের সব রাগও গাওয়া হত। প্রতি কোঠা থেকেই সেই সময়ে তানপুরা, সারেঙ্গী, হারমনিয়ম, ও তবলার আওয়াজ এবং গলার স্বরে ভরে উঠত প্রতি মহল্লা।

মার প্রিয় রাগ ছিল, পাহাড়ী। পাঞ্জাবী কাহারবা তালে গাইতেন একটি ঠুংরী। কানে যেন এখনও বাজে।

মায়ের গলার স্বরও মধুমাখা। অথচ তারই মধ্যে একটু নমকিনও ছিল।

"সাঁইয়া বিনা ঘর শুন
সাম্‌রিয়া না আয়ে।
যবসে বালম্ পরদেশ সিধারে
ও চ্যয়ন জিয়া নাহি পায় হ্যায় রাম।।"

জগমগিকেও মায়ের পাশে বসে গাইতে হত।

আরও একটি ঠুংরী গাইত মা, ঐ পাহাড়ী রাগেই।

সেই গানটি ছিল সাওনি তালে।

"মেরে লাগিরে মনোয়ামে চোট
য্যায়মন বসে তুম্ পাহাড়িয়া সাইঞা কি ওট
মনোহর লিনু দরশ না দিনু
মেরে সাইঞা কি মনোয়ামে খোট"।

আস্থাই-এর স্বরগম ছিল এই রকম :

সোহিনী রাগে একটি ঠুংরী গাইত মা ; ভারী পছন্দ ছিল জগমগির সে গানটিও। গানটির বাণী ছিল :

"যব ছোড় চলে শ্যাম ব্রজধাম
বাঁশীয়া না বোলে

ওর সুমধুর রাধানাম।
রিজ নরনারীনে আও বহাই
বিরহা কি তাপসে চিত মুরছাই।
সুধারখানি তালে বাঁধা ছিল গানটি।

খেয়ালও গাইত সমঝদার মেহমানদের জন্যে। তবে তা বেশিই গাওয়া হত অন্যত্র মুজরা পেলে।

জগমগির মায়ের খেয়ালের আলাপ সবচেয়ে ভাল লাগত ওর। তান বিস্তারে, লয়কারীতে, বাহাদুরী নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মায়ের যে কোন রাগেরই আলাপ শুনত চোখ বন্ধ করে জগমগি। আর সুরের কন্ আর শ্রুতি গুলোও, স্বরের কথা ত ছেড়েই দিল, যেন তার হাতে ধরা, কানের কাছে আনা তানপুরার তবলী আর ঘুরঞ্চে, তুম্বা আর তারগহণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুর ভর দিত। মনে হত, অন্য কোন বেহেস্তে চলে গেছে সে, যে বেহেস্ত এর কথা কুরান শরিফ বা হাদিসে কোথাওই লেখা নেই।

আলাপ শুনলে মনে হত, পাটনার গঙ্গার শীতকালে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উড়ে আসা পরিযায়ী হাঁসেরা যেন প্রথম ভোরে অথবা শেষ সন্ধেতে ধীরে, অতি ধীরে, জলে নামছে বা উঠছে। জলের ছোট ছোট, ঢেউ-ভাঙার মৃদু ; প্রায় অস্ফুট ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, কমলা-আভায় আভাসিত গঙ্গার জল, পলির মিষ্টি সোঁদা সোঁদা গন্ধ তাদের জলে নামা বা ওঠার সঙ্গে আলাপের যে কেন এতবড় সাদৃশ্য খুঁজে পেত কিশোরী জগমগি, তা ও ভেবে পায়না।

কিন্তু অবশ্যই পেত।

কখনও কখনও মা ডেকে, ওর বিনুনী নেড়ে দিয়ে বলত, তুই কি মীর্জা গালীব বা ফিরাক গোরখপুরী হবি? কবি হবি? না, উমরাও জান?

জগমগি হাসত।

ভাবত, হলে, ক্ষতি কি?

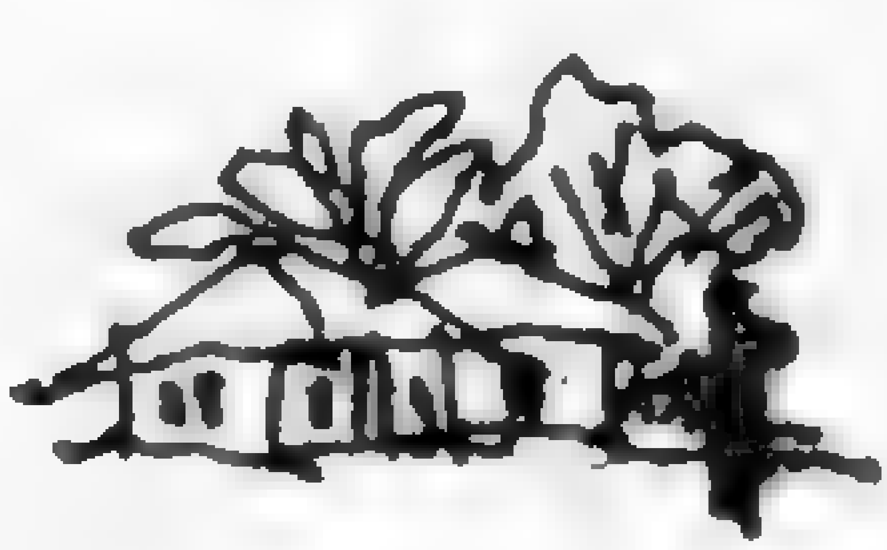

সেরেস্তাতে যাবেনা পূর্ণ আজ।

আর কোনদিনই যাবে না। ভাবতেই, মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

রোদ এসে পড়েছিল দরজার ফাঁকটি দিয়ে, পাশ ফিরে শুল। সেরেস্তাতে না গিয়ে তার বিকল্প হিসেবে কি করবে, তা ভাবতে ওর ভাল লাগল না সেই সুন্দর পাখি-ডাকা উঠোনের দেবশিশুদের চিক্কন-কণ্ঠ-ভরা সকালে।

গোপিনাথবাবুর ছেলে আর বনবিহারিবাবুর ছেলে-মেয়ে উঠোনে, রোদে মাদুর পেতে বসেই মুড়ি বাতাসা বা মুড়কি খাচ্ছে আর রঙীন ছবির বই নিয়ে পড়া-পড়া খেলা করছে। তিনজনেই শিশু এখনও। বনবিহারীবাবু নিশ্চই সিঁড়িতে বসে তাঁর পার্টির কাগজ পড়ছেন। সকালে উঠে লোকে গীতা পড়েন, কোরান পড়েন, বনবিহারীবাবু তাঁর পার্টির কাগজ পড়েন। ধর্মান্ধতার মতন, এও এক ধরনের অন্ধতা। এই অন্ধকার, গভীরতর।

.বড় কম বয়স থেকেই পূর্ণ জীবিকার চিন্তায় ক্লিষ্ট ছিল। এখন জীবনের চিন্তার জন্যে একটু সময়, অবশ্যই বের করে নিতে হবে। জীবনের চেয়ে জীবিকা বড় যে নয়, এই বোধটা অতি সম্প্রতি তার ভিতরে পল্লবিত হতে শুরু করেছে।

অবশ্য তার পেছনে জগমগির ভূমিকা আছে অনেকখানি।

সময় বের করতে হবে, এই জন্যে যে, সময় আর বেশি বাকি নেই। মানুষের জীবন শীতের বেলার মতন। কখন যে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়, বোঝার আগেই, তার কোন স্থিরতা নেই। সময়ের বড়ই টান এখানে, এই জীবনে; তাই আর সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।

শুয়ে শুয়েই মনে পড়ল, যোগিয়াতে একটি ঠুংরী গায় জগমগি। কানের মধ্যে

সেই গানটির সুরের মূর্ছনা শিশুকণ্ঠের চিকন নিক্বনে অনুরণিত হয়ে যেন ঝুমঝুম করতে লাগল।

"আনমিলো একবার
গহরা নদীয়া ম্যায় ত্যর না জানু।
মেরে সাজন যো রহে উস্‌পার
আনমিলো একবার।"

পূর্ণ রায়, ওরফে প্যানার মধ্যে সুর যে, এমন মানুষখেকো বাঘের মতন ঘাপটি মেরে এতবছর জীবনের পথের বাঁকে, পছন্দজ্ঞানের গ্রানাইট পাথরের চাঙড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, তার ঘাড়ে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে ভূতলশায়ী করবে বলে, তা কি ওই আগে জেনেছিল? যে ক'দিন হলো গোপিনাথপুরে এসেছে, সেই দিনগুলোর প্রথম দিকেও এমন করে ধরাশায়ী হয়নি। অথচ জগমগি ছিল দরজা খুললেই ; হাতের সামনে। দরজা জুড়ে। তার হৃদয় ভরে। তার সুরকে বা তার শরীরকে ছুঁতে, নাথুলাল ভোগতার কাছ থেকে কোনরকম বাধাই ছিল না। তবু, শুধু সুরকেই ছুঁয়েছে, এখনও শরীরকে ছোঁয়নি। শরীর ছোঁয়া সহজ, যখন তখন ছোঁয়া যেতে পারত; সুর ছোঁয়াটা অনেকই কঠিন। সে কথা জানত ও।

ভাবছিল, নাথুদার কাছ থেকে, আশ্চর্য, এক ধরনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ই পেয়েছিল। কিন্তু সুর যেমন মানুষখেকো বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে, তেমন ধীরে ধীরে স্লো-পয়জন করার মতন করে মারতেও পারে। রাধানগরের মতিন পাত্র যেমন সুরস্পৃষ্ট হয়ে মরেছিল; ইনকামট্যাক্স অফিসের পেছনেই যে খারাপ মেয়েদের পাড়া, সেই পাড়ার কাদম্বরীর হাতে। মতিন পাত্রর মতন এত বড় অসুরও যদি সুরের আঘাতে অমন ধরাশায়ী হতে পারে, তবে হয়ত সুরের অসাধ্য কোন কিছুই নেই।

আবেশ ছেড়ে, একসময়ে উঠেই পড়ল পূর্ণ। সময়টা কটা, তা জানতেও ইচ্ছা করল না। এমন নোঙ্গর-তোলা হালভাঙ্গা নৌকোর মতন চাল তার কখনওই ছিল না। জীবিকার সঙ্গে জীবন ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঘড়ির সঙ্গে হাত-পা। হঠাৎই এই শীতের রোদদুরে, কাক চড়াইয়ের ডাকের মধ্যে, নিজেকে বড় হালকা বলে মনে হতে লাগল ওর।

পূর্ণ কি শূন্য হয়ে গেল?

মনে হতে লাগল, এখন থেকে ও নিজেই নিজের মালিক। এ জীবনে কোন মালিকের, কোন বড় বা ছোট বা মেজ বা সেজ হাকিমেরই ধার ও আর ধারবে

না। হুজুর, মাঈ-বাপ সেলাম, মন-রাখা কথা, অন্যর নির্দেশে অসাধ্যসাধন করা, যখন তখন গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনার জন্যে যত্র-তত্র দৌড়নো পবন নন্দনের মতন ; অন্যের অঙ্গুলি হেলনে। অচেনা মানুষের পা-টেপা, মালিকের নির্দেশে, যেন ও কুকুর-মেকুর। এ সবের কিছুই আর ওর করতে হবে না। করবে না। ও আর জগমগি দুজনে দুজনের সুরের চাকরী করবে। ওরা দুজনে একে অন্যের মালিকও হবে, হবে চাকরও। দুজনের ভিতরের সুর ছেনে, শরীর ছেনে, ওদের সব সাধ ও স্বপ্ন দিয়ে সুরপুত্তলি বানাবে ওরা।

কি নাম দেবে ছেলে বা মেয়ের? কোন রাগ বা তালের নাম দেবে দুজনে যুক্তি করে। ওদের রক্তজাত সুরজাত উত্তরসূরীকে ওরা গোপিনাথবাবু আর বনবিহারীবাবুর ছেলে মেয়েদের মতন, অনাদরে, ধুলিময় উঠোনে পাটি পেতে ঈশ্বরের নামে ছেড়ে দেবে না। স্বয়ং ঈশ্বর করবে ওরা তাকে।

হাত-মুখ ধুয়ে ও ঠিক করল, বেরিয়ে পড়বে এবারে, হরিষদাদের বাড়ির দিকে। ঐ ব্যাপারটার ফয়সালা করতেই হবে।

যাওয়ার আগে, জগমগির মুখটা একবার দেখে যেতে পারলে ভাল লাগত। শীতের রাতে, কম্বলের নীচের শরীরের কবোষ্ণ তাপে, একা শুয়ে থাকতে থাকতে কত কীই যে কল্পনা করে ও। জগমগিকে ঘিরেই সব কল্পনা।

বাইরে বেরুবার জন্যে লুঙি ছেড়ে জামা-কাপড় পরছে, এমন সময় দেখল, নাথুদা বাইরে থেকে এল ; সঙ্গে একজন মাঝবয়সী দেঁহাতী মহিলা। সম্ভবত বিহারীই। মাথায় নেপালিদের মতন দগদগে লাল, তেলতেলে সিঁদুরের টিপ। একটা ঘন-নীল-রঙা সস্তা শাড়ি, মধ্যে জরির কাজ, চৌকো-চৌকো। তার নীচ থেকে লাল-রঙা শায়া বেরিয়ে আছে। পায়ে, প্লাস্টিকের গোলাপি-রঙা চটি।

ঘড়িটা হাতে পরতে পরতে, পূর্ণ বলল, কোত্থেকে এলে? নাথুদা?

এই। বাসস্ট্যান্ড থেকে।

জগমগি কোথায়?

সে নামাজ পড়ছে।

এখন?

বলেছিল ত নামাজ পড়ছে। সে অবশ্য আমি, যখন বেরোই তখন।

পূর্ণ চেয়ে দেখল, দরজাতে বাইরে থেকে তালাটা ঝুলোনো, যেমন থাকে। তার মানে জগমগি বেরিয়ে গেছে। ঘর খোলা রেখেই। আশ্চর্য ত! নাথুদার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ঘরে ঢোকা, নাথুদার কাছে কোন সমস্যা নয়। তা সত্ত্বেও ঘর খোলা রেখে কোথায় গেল জগমগি? আজ একটু বেশিক্ষণ ঘুমিয়েছেও ও।

নাথুদা ও পূর্ণ দুজনেই অবাক হল, নাথুদাকে কিছু না বলে, ঘর খোলা রেখে এমন করে জগমগির বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কোথায় গেল, কখন ফিরবে ; তাই বা কে জানে। ওর সঙ্গে যে অনেকই কথা ছিল, শলা-পরামর্শ। তাছাড়া, পূর্ণ যদি আজ বাড়িতে থাকে, তাহলে নসু মোক্তার এসে অনেকক্ষণ যাত্রা করবে, অ্যাক্টিং ; নস্যি নেবে বারবার, আর ফোঁচ-ফোঁচ করবে।

মহিলা কে? সেকথা জিগগেস করল না পূর্ণ, নাথুদাকে। তবে, যে-কদিন এখানে আছে, নাথুদার কাছে কোন মহিলাকেই আসতে দেখেনি।

পূর্ণ, বাইরে এসে ; পথে পড়ল। এদিকটা নির্জন। শহরের এক প্রান্তে। এখনও গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি আছে কিছু। সজনে, মাদার, চালতা, গোলাপ জাম, কালো জাম, জলপাই, আম ; এই সব। আমলকি, আমড়া এবং পেয়ারাও আছে।

মাঝে মাঝে পথে ছায়া পড়েছে। শীতের দিনে, শীত শীত করে ওঠে গা ছায়াতে এলে। রোদ ঝিলমিল করছে নানা গাছের ডাল-পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে, যেখানে পথ রৌদ্রালোকিত নয়, সেখানে। পথের উপরে বুনো-কবুতরের ঝাঁক, কি যেন খুঁটে খাচ্ছিল। কোনোরকম শস্য-বোঝাই গরুর গাড়ি থেকে হয়ত পড়েছে পথে। এগোতেই দেখল, গম পড়েছে। গম-ভাঙানোর কলের দিকে যেতে।

পাখ-সাট এ ঝটপট শব্দ করে উড়ে গেল একই সঙ্গে বুনো কবুতরেরা, ও কাছে আসতেই। পূর্ণর মনে হল, ওকে যেন ওরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। বুনো কবুতর-কবুতরীর মতন হবার আশীর্বাদ করল পূর্ণ আর জগমগিকে। স্বাধীনতায় এবং সোহাগে।

দু-ফার্লং মতন গিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানে রোদে পিঠ দিয়ে, দোকানের সামনের বেঞ্চে ও বসল।

এই দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করেছে সাইকেলে প্রত্যহ এতদিন। সকালে এবং রাতে। অথচ, থামা হয়নি একদিনও। যাওয়ার সময়ে, তাড়া থেকেছে প্রতিদিনই ; কাজের। কোন না কোন মক্কেলকে আসতেই বলেছে। কারো রিটার্ণ ভরতে হবে, কারো ছ নম্বর ফর্ম, কারও রেজিস্ট্রেশান রিনিউয়ালের অ্যাপ্লিকেশান, কারও দলিল করতে হবে নতুন, কারও বা ডিসল্যুশান ডিড, কারও অ্যামেন্ডমেন্ট। এসব কাজ অতি সাধারণ। কিন্তু গেঁয়ো ব্যবসায়ী এবং তাদের মুহুরীরা ইংরেজি জানেনা বলেই পূর্ণকে সব-কিছুই করে দিতে হয়। কারও খাতাতে ক্যাশ ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, কি করে জমা করা যায় ক্যাশ? কারও বা নাজাই হয়ে যাচ্ছে বহু টাকা,

কোন বছরে খরচ লিখলে হাকিম ডিসঅ্যালাউ করবেন না? এমন কত কাজ। "গভীর" সব সমস্যা। তাই দেরি করার উপায় ছিল না একদিনও। সপ্তাহে সাতদিনই।

মফঃস্বলের উকিল মোক্তারের সেরেস্তাতে ছুটির দিন বলে কিছু নেই। উকিল মোক্তারের থাকলেও, তাঁদের সহকারীদের আদৌ নেই।

ফেরার পথেও সেই অবস্থাই রোজ।

যখন পূর্ণ ফেরে, রাত করে ; জগার হোটেলে খেয়ে, তখন এই দোকানের উনুনের আঁচ ফেলে দেওয়া হয়।

ওর খিদের উনুনের আঁচও ফেলে দেয় ও তখন।

গরম গরম সিঙ্গারা ভাজা হচ্ছে। সঙ্গে ধনেপাতা কাঁচা-লঙ্কার চাটনি। দুটো সিঙ্গারা অর্ডার করল।

বলল, একটু কড়া করে ভাই। লালচে হয় যেন।

প্লেটে করে, খাকি প্যান্ট আর গেঞ্জী-পরা ছেলেটা, প্যানারই সমগোত্রীয়, এবং আশ্চর্য। ওর নামও প্যানা ; ওরও ছুটি নেই, সিঙ্গারা এনে দিল ; চাটনির সঙ্গে।

পূর্ণ বলল, একটা চা। বেশি করে দুধ-চিনি দিয়ে।

দারুণ লাগছিল ওর এই মুক্তির স্বাদ। রোদে পিঠ দিয়ে বসে, সিঙ্গারা খেতে খেতে।

ভাবছিল, সাতসকালে জগমগিটা গেল কোথায়? ও থাকলে, ওকেও সঙ্গে এনে চা সিঙ্গারা খাওয়াত। ও চাকরি করেনা বটে, তবে নাথুদার সঙ্গে থাকাটাও ত একরকমের চাকরিই! শুধু ডাল-রুটি আর সাধারণ জামা কাপড়ের চাকরি। তার বদলে কাজও ত কম করে দেয় না ও।

জগমগি বহুদিন থেকেই বলত পূর্ণকে, ওদের সঙ্গেই খেতে। তাতে, অনেক টাকার সাশ্রয় হবে পূর্ণর। কিন্তু পূর্ণই রাজী হয়নি, ওদেরই অসুবিধে হবে বলে। ওর ত ফেরার কোন ঠিকই নেই। দুপুরে ত হোটেলে খেতে হয়ই এমনিতেই। তার জন্যে অবশ্য দৈনিক পাঁচটি টাকা ধরে দেন নসুমোক্তার। পাঁচটাকাতে যেমন খাওয়া হতে পারে, তার উপরে তাড়াহুড়োয় ; তেমনিই খায়। বরং রাতের খাওয়াটা, হোটেলে খেলেও ; ভাল করে চিবিয়ে, ধীরে সুস্থে খায়। খেতে খেতে অনেককিছু, ভাবেও।

কোন কোনদিন হঠাৎ হঠাৎ হাজারীবাগের সিলাওয়ার পাহাড়ের কাছের চামেলি মাসীকে মনে পড়ে যায়। গান-বাজনা নিয়েই থাকতো মাসী-মোসো। কত ভাল ভাল ওস্তাদের গান শুনেছে যে পূর্ণ, সে বাড়িতে। ওর বাবাই নিয়ে যেতেন

ওকে। বাবা নিজেও খুব ভাল ধ্রুপদ-ধামার গাইতেন। গানের জগতেই বুঁদ থাকতেন। কাকারা ছিলেন মেন অফ দ্যা ওয়ার্লর্ড! হুঁশিয়ার। "ফেরেলবাজ"। বাবা চোখ বোঁজার আগেই তলে তলে সব সম্পত্তি হস্তান্তর করে রেখেছিলেন তাঁরা। মদের ঝোঁকে বাবাকে দিয়ে রাতের বেলা সই-সাবুদ সব করিয়ে নিতেন।

পরদিন বাবা বলতেন, কি সই করালি? তার কপি দিস একটা।

সেজকাকা বলতেন, দেব।

বাবা ভুলে যেতেন!

তানপুরা হাতে, বাবার পায়ের কাছে বসে, ওদের পাগমল-এর বাড়ির দোতলার পশ্চিমের বারান্দাতে গ্রীষ্মে, আর পুবের বারান্দাতে শীতের সকালে, কত কিছুই যে শিখেছিল পূর্ণ! কী আনন্দের দিন ছিল সে সব।

এস্রাজ নিয়ে আসতেন নিধুজেঠু। বড় মিঠে হাত ছিল। ক্যানহারী হিল রোডে বাড়ি ছিল। বহত শৌখিন মানুষ। আর তবলাতে থাকতেন জগনুভাই। বাবার চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে ডাকতেন জগনু ভাই বলে। পূর্ণও ডাকত। এমন অনেকে থাকেন, যাঁদের বয়স হলেও, বয়স হয় না কোনদিনও।

মাঝে মাঝে পাটনা থেকে জগলুল চাচা আসতেন। থাকতেন দিনকতক ওদের বাড়িতে। তখন খুব খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা হত। জগলুলু চাচা যেদিন হারমনিয়মে বসতেন, হারমনিয়মে সেদিন বিদ্যুৎ খেলে যেত।

সামসের চাচাও আসতেন মাঝে মাঝে। ওঁর বাড়ি ছিল বেলোয়াটিকার-এ। খুব ভাল দাদরা আর কাওয়ালি গাইতেন উনি। শীত গ্রীষ্ম, সবসময় ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী। বুকের বোতাম একটাও লাগাতেন না, হাজারীবাগের ডিসেম্বর-জানুয়ারীর ঠাণ্ডাতেও। ফুটো-ফুটো, হাত-কাটা গেঞ্জী পরতেন। সেই গেঞ্জী আর পাঞ্জাবী থেকে ফুটে বেরুত তাঁর গোলাপি রঙ আর কুচকুচে কাল বুকের চুলের ছটা। গা থেকে উগ্র গন্ধ বেরোত আতরের। গ্রীষ্মে খসস, বর্ষায় খসস, বসন্তে গুলাব, আর শীতে হিন্বা। মাঝে মাঝে ; গরমে ফিরদৌস আর শীতে অম্বরও ব্যবহার করতেন। মনে আছে। মুখ-ভর্তি বানারসী মঘী পান। আর লাল ডিব্বাতে, ছশো-নম্বরের বাবা-জর্দা। আঃ। সেই গন্ধ এখনও নাকে আসে।

কোথায় যে চলে গেল হাজারীবাগটা। তার ছেলেবেলার, প্রথম যৌবনের হাজারীবাগ।

সিঙ্গারার প্লেটটা ফেরৎ দিয়ে, চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে ভাবছিল পূর্ণ, জগমগিকে নিয়ে একবার হাজারীবাগে যেতে হবে।

আগে একটা কাজ জোগাড় করা দরকার। তবে সেটা গোপিনাথপুরেও নয়,

হাজারীবাগেও নয়। অন্যত্র। হাজারীবাগের রায়েদের বাড়ির বড় শরিকের ছেলে হাজারীবাগের কোন ব্যাপারীর খাতা লিখছে বা উকিল-মোক্তারের সেরেস্তা আগলাচ্ছে, এ কথা রটে গেলে, বাবা মায়ের আত্মা কোনদিনও শান্তি পাবেনা।

কিছু কিছু ঘটনা বা রটনা থাকে, যা নিজের কারণে নয়, ভালবাসার বা শ্রদ্ধার জনের সুখের বা সম্মানের কারণে বর্জন করে চলতে হয়ই।

চা-সিঙ্গারার পয়সা দিয়ে, উঠে পড়ল। ভাবনা, একবার মাথাতে এলে, শীত-শেষের রাতের কুয়াশারই মতন, তা কেবলই ছড়িয়ে যেতে থাকে দ্রুত। সবকিছুই আচ্ছন্ন করে ফেলে। শরীর অলস হয়ে যায় ; ছেড়ে দেয়। তখন মনই মালিক হয় শরীরের।

পায়ে হেঁটে যেতে ভারী ভাল লাগছে। এই পথটুকু, কখনওই পায়ে-মাড়ানোর সৌভাগ্য হয়নি আগে। নসুমোক্তারেরই ঠিক করে দেওয়া বাসা থেকে, তার দেয়া সাইকেলে চড়ে, পথ পেরুনো এক, আর পায়ে হেঁটে পথ পেরুনো আর এক। পায়ে হেঁটে চললে, প্রতি-ইঞ্চি পথ, ধুলো, পথপাশের ঘাসফুল, গাছ-পালা, পাখি প্রজাপতি, সবকিছুকেই জরীপ করতে করতে চলা যায়। ভাবতে ভাবতে যাওয়া যায়। ভাবনাটুকুর ক্ষমতা আছে বলেই সে মনুষ্যেতর জীব নয় মানুষ।

ভাবছিল, পূর্ণ।

হরিষদাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই প্রচণ্ড চিৎকার আর উঁচুগ্রামে রেডিওর আওয়াজ যুগপৎ কানে এল।

কাছে যেতেই চিনতে পারল গলা। হরিষদার। আর রেডিওটা বাজছে, বিষাদের ঘরে। দিনের এই সময়ে কোনদিন আসেনি পূর্ণ বিষাদের কাছে।

একটু ভয় পেয়েই ও বিষাদের ঘরে ঢুকে পড়ল।

বিষাদ ঐ চেঁচামেচির মধ্যেই নরেন মিত্রর নতুন-বেরুনো গল্পসংকলন 'কাঠগোলাপ' পড়ছিল।

রেডিওর মনে রেডিও বাজছিল। রেডিওতে কেউ পাটচাষীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। ভদ্রলোকের উচ্চারণও জড়ানো। ভল্যুম অত জোরে করে দেওয়াতে আরওই বোঝা যাচ্ছিল না।

না-বলে-কয়ে যাওয়াতে হয়তবিষাদ একটু অবাক এবং অপ্রসন্নও হয়ে বলল, কি রে? তুই? অসময়ে?

পূর্ণ, চেঁচামেচির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কি? ব্যাপার কি?

ও কিছু নয়। রুটিন। রোজই হয়।

রোজ? কেন?

টেনশান রিলিজড হয় এইভাবে। অন্য অনেকভাবেও করা যেত। কিন্তু করে না। তোদের ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সবারই কি এমন টেনশান? তাছাড়া, রোজই একই কথা। একই কথা। একই কথা। রাতের হ্যাঙ্গওভার থাকে বোধহয় দাদার। রোজ একা এক পাঁইট রাম। চাট্টিখানি কথা।

কার উপরে রাগ? বউদির উপরে?

আর কার উপরে? এত রাগ নীরবে আর সইবে কে?

কেন? সেই মোটর সাইকেল?

না। সেটার কথা দুদিন হল ভুলে গেছে। পাওনাও তামাদি হয়ে গেছে। দশবছর আগে বৌদির বিয়েতে বৌদির দাদা আমকাঠের ফার্ণিচার সেগুন কাঠের পালিশ লাগিয়ে সেগুন বলে চালিয়ে ছিল, সেই থেকে রাগ।

এত বছর পুষে রেখেছে?

হ্যাঁ। রাগও গিনিপিগের মতন। পুষে রাখলেই অগুন্তি বাচ্চা পাড়বে। বাড়তেই থাকবে।

আসলে, দাদার গলার জুয়ারী এই জন্যেই এত ভাল। রোজ, এই সময়ে, এই নিয়ে, চিৎকার করবেই দাদা। অফিস যেদিন ছুটি থাকে, সেদিন করে না। আশ্চর্য। কে জানে। কেন এমন হয়। অথচ ছুটির আগের দিন মাল খায় অন্যদিনের চেয়েও বেশি।

তারপর নিজের মনেই বলল, হয়ত টেনশান রিলিজড হয়। কিন্তু তাও ত...

বৌদি কি বলেন? ঝুমু বৌদি?

কি বলবেন? কত বলবেন? কিছুই আর বলেন না। ওদের সম্পর্কও নষ্ট হয়ে গেছে বহুদিন। সে জন্যেই....। দাদা বাড়ি করবে ভবিষ্যতে, তাই মেনে নেয়। দাদা দুধে-ভাতে ত রেখেছে। বৌদি ঘরণী না হতে পেরেও, ঘর নিয়েই খুশি থাকে বোধহয়।

পূর্ণ জানে। একদিন ত দেখেইছে নিজ চোখে।

তাই, আর কথা বাড়াল না।

নষ্ট হয়ে গেছে, না বিষাদই নষ্ট করেছে ঝুমুকে ; কে জানে। কারো কারো মধ্যে নষ্ট হবার প্রবণতা থাকে, কারো কারো মধ্যে নষ্ট করার। এতদিন হরিষদার আনন্দর কথাটাই জানত, কষ্টর কথাটা জানত না। আলোকিত দিকটা জানত, অন্ধকারের দিকটা জানত না। প্রত্যেক মানুষেরই আলো এবং অন্ধকারে বাস।

দিশেহারা, অসহায়ের মতন পূর্ণ বলল, আমার কথা ছিল, হরিষদার সঙ্গে। কিন্তু...

তুই ঘরের সামনে গিয়ে হরিষদা বলে ডাক দেখি একবার। দেখবি, একেবারে নর্ম্যাল।

বিষাদ বলল, পূর্ণকে।

তারপরই বলল, জানিস, মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয় যে, এই রাগটা পুরোটাই মিথ্যে লোক দেখানো। যা না, গিয়ে ডাক। তারপর কথা শেষ করে আমার কাছে আসিস।

আমার ভয় করছে।

পূর্ণ বলল।

হরিষদার এমন রূপ কখনও যে দেখিনি।

আরে কোন ভয় নেই। যা, আমি বলছি।

পূর্ণ, বিষাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, হরিষদাদের ঘরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে গলা তুলে ডাকল, হরিষদা।

কে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল।

আমি পূর্ণ।

গলা সেই উচ্চগ্রামেই রেখে, হরিষদা বলল, কোন পূর্ণ?

প্যানা।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে, হরিষদা বাইরে এল। অফিস যাবার জামা-কাপড় পড়েই ছিল। অবাক-হওয়া গলায় বলল, প্যানা! কি রে? হঠাৎ এই অসময়ে? নসুমোক্তারের কাজ ছেড়েছিস ত। আমি খবর পেয়েছি। কাজ ঠিক করে দিতে হবে ত? বল, কত কাজ চাস। কাজ-জানা লোকের আবার কাজের অভাব কি?

না। কাজ চাই না। আমি দু'একদিনের মধ্যেই গোপিনাথপুরই ছেড়ে চলে যাব। কাজের জন্যে আসিনি হরিষদা। অন্য কথা ছিল।

অন্য কথা? কি কথা? পূর্ণতর হতে চাস নাকি?

জগমগির ব্যাপারটা....

কোন ব্যাপারটা? পেট করে দিয়েছিস নাকি? পেট খসাতে হবে?

পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড় হাকিম, ছোট হাকিমের ঘরে, মোক্তার-উকিলদের সামনে যে হরিষদাকে ও দেখেছে, তার সঙ্গে এঁর কিছুমাত্রও মিল নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে বোধহয় একটা মুখোস পড়ে নেয়, অথবা, বাড়িতে ঢোকার সময়ে। কী আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, একটু ধাতস্থ হয়ে, পূর্ণ বলল, জগমগি যে, ঐ বাংলোয়

গিয়ে নাচবে গাইবে বলেছিলে তুমি, নাথুদা যে হাজার টাকা নিয়েছিল, সেসব কার কাছ থেকে শুনেছিলে?

উত্তরে কিছুই না বলে, হাসিতে ফেটে পড়ল হরিষ।

হাসতেই লাগল। হাসি আর থামেই না।

অনেকক্ষণ পর, হাসি থামিয়ে বলল, তবে রহমান ত ঠিকই বলেছিল দেখছি।

কি? কি বলেছিলেন? রহমানদা?

পূর্ণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

তোর সঙ্গে জগমগির লটরপটর।

লটরপটর মানে?

মানে, রমদা-রমদি।

আঃ। খুলেই বলনা হরিষদা? কি সব বলছ, মানে বুঝি না।

খুলেই ত বলছি। রহমানের আসলে বোধহয় রাগ আছে জগমগির উপর। মুসলমানের মেয়ে হয়ে রামভক্ত হনুমানের সঙ্গে ঘর করছে যে, তার জন্যে।

তারপরে একটু থেমে বলল, তাছাড়া, কি জানি! হয়ত জগমগির উপরে তার অন্য চোখও আছে। কার দিকে, কে, কোন চোখে তাকায়; তার ত ঠিক-ঠিকানা নেই।

তারপরই বলল, ঐ ঘোষাকিটা একটা হারামী। এক নম্বরের ক্যারাক্টারলেস। তুই ত সারা জীবন ফাইলের মধ্যে নাক ডুবিয়েই রইলি। তুই জগতের খোঁজ কি রাখিস? নাক ডোবাবার আরও অনেক জায়গা যে আছে, তা কি তুই জানিস?

মানে?

মানে, রহমান প্লাস ঘোষাকি অ্যাক্সিসের কথা বলছি আর কী।

সেটা কি?

একে অন্যকে মাগীর যোগান দেয় ওরা।

ছিঃ। কি ভাষায় কথা বলছ হরিষদা।

না বলে, আর পারল না পূর্ণ।

আমাকে ভাষা শেখাস না। কলকাতার যাদবপুরের কম্পারেটিভ লিটারেচারে এম. এ করেছিলাম আমি, তা জানিস? আমাকে ভাষা শেখাস না।

অবাক হয়ে গেল পূর্ণ।

বলল, জানতাম না ত!

ছাড়! ছাড়! ওসব ডিগ্রীর জন্যে পড়েছিলাম। থমাস মান, সল রিলকে, হেমিংওয়ে ব্যোদলেয়র, রবার্ট ফ্রস্ট। সব ফস-স-স-স। একটু থেমে বলল, মাস্টারী করে কটা টাকা পেতাম? আর মাস্টাররাও কি সবাই সাধুচরিত্রের সতী?

জিগেস করিস বিষাদকে। টিচিং লাইনে গেলাম না, এখানে প্রসপেক্ট অনেকই বেশি তাই.....

পূর্ণ অবাক হয়ে ভাবছিল, ও ভাগ্যিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি। এই মানুষ....

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রহমনদা ত তোমারও বন্ধু।

তা ত বন্ধুই।

তাহলে?

তাহলে আর কি! আমি ত ভণ্ড সন্ন্যাসী নই। প্রকৃত পুরুষ মানুষের ওসব দোষ একটু-আধটু থাকেই। এক বউএ আর কোন মরদের চলে? আমরা ভণ্ড। মুসলমানেরা নয়। তাই, ওদের ধর্মেই আছে একাধিক বউ-রাখা অপরাধের নয়।

বৌদি শুনতে পাচ্ছেন। আস্তে, হরিষদা।

পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

পেলে, পাক। সত্যি কথার আবার অত লুকো-চাপা কিসের?

পূর্ণর, হরিষদা সম্বন্ধে একেবারেই অন্যরকম ধারণা ছিল। যে-মানুষটা এত ভাল গান গায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তর গান গায়, তার রুচি এত স্থূল হয় কি করে?

ভাবছিল ও।

আবার বলল পূর্ণ, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নর উত্তর দাওনি। হরিষদা।

উত্তর নেই। তাই দিইনি। রহমানের কাছে জগমগির প্রতি তোর দুর্বলতার কথা শুনে আমি আন্দাজেই একটা ঢিল ছুঁড়েছিলাম তোর দিকে। তোর পেট থেকে কথা বের করার জন্যে। পেট থেকে কথা বের করা, পেট-খসানোর চেয়েও অনেকই কঠিন। বুঝলি। অবশ্য, কথা তুই একটাও বলিসনি। কিন্তু তোর মুখ চোখ দেখেই বুঝেছিলাম যে, রহমানের কথাটা সত্যি। তুই ব্যাচেলর মানুষ। একটি মাত্র মেয়েছেলের সঙ্গে লটর-পটর বা রমদা-রমদি করবি, তাতে দোষেরই বা কি? দশজনের সঙ্গে করলেও ত আমি দোষের কিছু দেখি না। তোর ত লাইসেন্সই আছে। মিউনিসিপলিটির স্টাড-বুলের মতন। একটু থেমে বলল, স্টাড-বুল কাকে বলে জানিস? এ তোর জাবদা-খাতাতে লেখা থাকেনা। যে ষাঁড় দিয়ে পাল পাল, গরুকে "পাল-খাওয়ানো" হয়। বুঝেছিস?

তারপর থেমে বলল, তা, তুই এত এমবারাসড ফিল করছিস কেন?

না। আসলে কিছুই নেই। মনে মনে... মিছি মিছি.....

হরিষদা আবার হাঃ। হাঃ। হাঃ করে হাসতে লাগল।

বলল, কি বললি? মনে মনে...? হাঃ এই করেই বাঙালী জাতটা গেল। পুরুষই

নেই এই জাতে। মেয়েছেলের সঙ্গে আবার মনে মনে কি হয় র‍্যা। যা হয়, তা...

বাক্যটা শেষ করতে গিয়েও যে, দয়া করে করল না এ জন্যে পূর্ণ কৃতজ্ঞ রইল হরিষদার কাছে।

মনে মনে ভাবল, এই সর্বজ্ঞ মানুষটি আর যাই জানুক, মেয়েদের জানে না।

হরিষদা বলল, বাংলোতে গিয়ে নাচ-গান, টাকা আগাম দেওয়া, এ সবই বোগাস। এক্স-টেম্পর, বানিয়ে-বলা আমার। তবে, তোকে একটা কথা বলব। মেয়েছেলেকে যদি বাগাতে চাস তাহলে মনে মনে....করলে কিছুই হবেনা। ফ্যাল ভক্তা, মার পেরেক। ওরা শুধু ঐটাই বোঝে। প্রেম-ফ্রেম, মনে—মনের প্রেম এসব কি ওরা বোঝে নাকি? ওদের বিধাতা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট করে বানিয়েছেন বলেই না ওদের স্থান আমাদের নীচে? কখনও মেয়েছেলেদের ছেড়ে রাখবিনা বেশিদিন। মনে-মনে যখন তুই করছিস, তখন অন্য জনে আসল কাজটি করে দিয়ে, খাঁচা-খুলে পাখি উড়িয়ে দেবে। নয়ত, নিজের দাঁড়ে বসিয়ে নিয়ে চলে যাবে তোর নাকের সামনে দিয়ে, ড্যাং-ড্যাং করতে করতে।

একটু চুপ করে থেকে, যেন দম নিয়ে বলল, ন্যাকা-বোকা আর কতদিন হয়ে থাকবি? তোর ঐ সাদা-গোদা আই এ সি, কমিশনারবাবুদের পা টিপেই জীবন যাবে, নসুমোক্তারের টাকা রোজগারের ফটাফট মেশিন হয়ে থেকে। তোর বরাদ্দ আর কিসসুই নেই।

পূর্ণ, মনেরই কারবারী।

ও মনে মনে বলছিল, হরিষদা। তোমাদের এই গোপিনাথপুর আর রাধানগরের ইনকামট্যাক্সের জগতের তুলনাতে আমার জগতটা অনেকই বড়। ইনকাম-ট্যাক্স এর জগত এই বিশ্ব-জগতের কতটুকু? কতটুকু?

হরিষ, গলা একটু চড়িয়ে বলল, এই যে শুনছ! পূর্ণ এসেছে। ওকে একটু চা-টা খাওয়াও। দুপরে খাইয়ে দাও। হোটেলে হোটেলে খেয়েই ত কাটিয়ে দিল সারাজীবন। আমি এবার বেরোচ্ছিরে। বোস তুই, প্যানা। পূর্ণতম। আমি এগোই। চার চারটে ইনসপেকশান আছে আজ।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, আমি আর কি পাইরে? আমার হাতে ত অ্যাসেসমেন্ট করার কলম নেই। সেত, ছোট হাকিমের হাতে। আমি ত তাঁর জন্যে FODDER যোগাই ; বুঝলি কিনা, ষাঁড়ের-খাদ্য। আমি এগোই।

বলেই, মোটর সাইকেলটা যেখানে রাখে; সেদিকে এগিয়ে গেল।

ঝুমু বৌদি একবার দরজা থেকে বের করে সুন্দর মুখটি দেখিয়েই বললেন, বোসো পূর্ণ, বিষাদের ঘরে। আমি আসছি।

আসলে, যেদিন থেকে পূর্ণর কাছে বৌদি ধরা পড়ে গেছিলেন, সেদিন থেকেই পূর্ণকে অ্যাভয়েড করেন বৌদি। বোধহয় ভাবেন, যদি হরিষদাকে কখনও বলে দেয় ও।

ঝুমু বৌদির জন্যে বড়ই করুণা হল পূর্ণর, এই মুহূর্তে।

ভাবল, বিষাদটা একটা রিয়্যাল ম্যাদা-মারা। যে মাইনেই পাক, তাতেই ওর উচিত বৌদিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া, ভাল যদি সত্যিই তাকে বাসে। ঐ নিঃসন্তান মহিলার জীবনে বিষাদ ছাড়া ত আর কেউই নেই। সুখী করুক ও বৌদিকে, শরীরে-মনে সুখী করুক, সন্তানও দিক তাকে।

বিষাদের ঘরে যেতেই, বিষাদ বই নামিয়ে রেখে, নীচু, স্বাভাবিক গলাতে বলল, আয়, বোস। রেডিওটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল।

পূর্ণ বলল, হরিষদা, তুলনামূলক সাহিত্যে এম এ? আর এখন লস-প্রফিটের পার্সেন্টেজ কষে, কনস্ট্রাকসনের মাপ-জোক ; ট্যাক্স ক্যালকুলেশন নিয়ে দিন কাটাচ্ছে?

বিষাদ মাথা নাড়ল। বলল, ওরে। এই সংসারে রিলকে অথবা ব্যোদলেয়রের চেয়ে ভেলিগুড় আর খোল-ভুষি, আটা ময়দার হিসেবটাও কম মূল্যবান নয়। যদি কম মূল্যবানই হত, তবে দাদা ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ঢুকবে কেন? সংসারে সব ব্যাপারেই রিলেটিভ। নানা সরকারী অফিসে খোঁজ করলে, এমন মানুষ অনেকই পাবি।

তারপর বিষাদ বলল, কি রে ! দাঁড়িয়ে কেন? বোস। ঘোড়া বেঁধে এসেছিস বলে মনে হচ্ছে আজ।

পূর্ণ বলল, আমি আজ আর বসব না। তাড়া আছে।

কেন? তাড়া কিসের হঠাৎ আজ?

আমি গোপিনাথপুর ছেড়ে চিরদিনের মতন চলে যাব। প্রায় মনস্থই করেছি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু করণীয় আছে।

কোথায় যাবি? তুই? হঠাৎ?

চমকে উঠে বলল, বিষাদ।

এমনভাবে বলল, যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই গোপিনাথপুরেই বাস করে। এবং চিরদিনই করবে। গোপিনাথপুর ছাড়া, মানুষের আর যাওয়ার জায়গাই নেই, থাকার, রুজী-রোজগারেরও জায়গা নেই। এখানেই মানুষকে ওর মতন, জগমগির মতন, ঝুমুবৌদির মতন এবং বিষাদেরও মতন, না-বেঁচেও বেঁচে আছে বলে জেনে নিয়ে, তবুও বাঁচতেই হবে। পাছে, লোকে কিছু বলে।

বিষাদ, আবারও বলল, যাবিটা কোথায়? হঠাৎ? আর যাবিই বা কেন? তাছাড়া, তোর ত যাবার কোন জায়গাও নেই। হাজারীবাগে ত আর ফিরে যেতে পারবি না। তবে?

জানি না, কোথায় যাব। তবে, যাব ; কোথাও। একটু থেমে বিষাদ বলল, আসলে, বেরিয়ে পড়াটাই মুশকিলের। পৌঁছনোটা বোধহয় তেমন নয়। বেরিয়ে পড়তে পারলে, গন্তব্যর অভাব হয় না।

বলেই বলল, তোর কিন্তু একটা কিছু করা উচিত বিষাদ।

কি? কি বিষয়ে? করা উচিত মানে? বলছিস কি?

বৌদির বিষয়ে। ঝুমু বৌদির বিষয়ে। বুঝে, যদি না বুঝিস.....

কি বলছিস কি তুই? মানে, কি বলতে চাইছিস? তুই কিন্তু তোর এক্তিয়ার ছাড়িয়ে যাচ্ছিস পূর্ণ।

স্তব্ধ হয়ে, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পূর্ণ।

ও ভাবছিল, দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বেশি খারাপ? বিষাদকে যে এতদিন গোপিনাথপুরের একমাত্র বন্ধু বলে জেনে এসেছিল, তা যে কতবড় ভুল ; তা এই মুহূর্তে বুঝল পূর্ণ। সারা জীবনের পথ-পরিক্রমাতে বন্ধুত্ব বোধহয় একজন-দুজনের সঙ্গেই হয় ; তাও যদি হয়।

বিষাদ গুমম হয়ে ছিল। ওর মুখটা লাল হয়ে গেছিল।

পূর্ণ ভাবছিল, চেয়ার টেনে বসে বলে যে, গান-বাজনা করলে, সাহিত্য করলে, সাহিত্য পড়লেই, শুধুমাত্র সে কারণেই মানুষ অন্যদের চেয়ে কিছু শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় না, যদি না, প্রয়োজনে সে মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যা অবশ্য-করণীয় ; তা করতে পারে। এই ঘোমটার তলায় খেমটা নাচই নাচবে যদি, তাহলে আর বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করে কি লাভ? লিটলম্যাগ আন্দোলন, বামপন্থী সাহিত্য, কলকাতার আঁতেলদের নিয়ে আলোচনা, বাখ, বীটোভেন, মোৎজার্ট কপচানো কিসের জন্যে? মানুষ হয়ে জন্মানোর প্রথম শর্তই হল এই যে, তার মনুষ্যত্ব পশুত্বকে মাড়িয়ে তার জয়ধ্বজা তুলবে।

বিষাদের রাগটা পড়েছিল। কিন্তু বিব্রত মুখে তাকিয়ে ছিল তখনও পূর্ণর মুখে। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে কোন অনুতাপ ছিল না।

পূর্ণ বলল, তোকে বলতে এসেছিলাম যে, আমি হয়ত কালই বা হয়ত আজ রাতেই চলে যাব। আমার ঘরের চাবিটা রেখে যাব নাথুদার কাছে। তুই, চাবিটা নিয়ে, সময় করে, আমার বইগুলো, ক্যাসেট, রেকর্ড, ক্যাসেট-প্লেয়ার, জল রঙ

তেল রঙ-এর প্রিন্টগুলো ; মানে যা-কিছুই আছে, সবই নিয়ে আসিস। তোকে আর ঝুমু বৌদিকে দিয়ে গেলাম ওগুলো সব।

কেন? আমাকে বা বৌদিকেই শুধু কেন?

প্রথম কারণ, এসবের কদর করে, এমন মানুষ, মানে, আমার জানা মানুষ ; এই গোপিনাথপুরে আর নেই। দ্বিতীয় কারণ, আমি আশা করব যে ; তুই ঝুমু বৌদিকে নিয়ে আলাদা বাসা করবি। এবং সেই বাসাতে আমার জিনিসগুলি তোদের দুজনেরই কাছে থাকবে। তোদের দুজনের রুচি এবং আমার রুচির সঙ্গে ত খুবই মিল। অন্ততঃ ছিল বলেই জেনে এসেছি এত দিন।

বিষাদ হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে, কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে ঝুমু এসে ঘরে ঢুকল।

চান করে উঠেছে সবে। চুল খোলা। লাল কালো একটা শান্তিপুরী ডুরে শাড়ি পরেছে। গায়ে, ফিকে-লাল হাফহাতা সোয়েটার। ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে ঝুমু বৌদির চুলের ফুলেল তেলের গন্ধে ভরে গেল। সকালটাই যেন সুগন্ধি হয়ে গেল।

তার বয়স এমন কিছু না। কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এখন ত্রিশ। হরিষদা, বয়সে, প্রায় দশবছরে বড় ঝুমু বৌদির চেয়ে।

পূর্ণ, কি খাবে বল?

বুদ্ধিদীপ্ত, কাজল-দেওয়া, সুন্দর দুটি চোখ তুলে, এই হেমন্তর সকালকে স্নিগ্ধ করে বলল, ঝুমু বৌদি।

তারপর বলল, তুমি ত আসোই না আজকাল। বিষাদই ত গিয়ে পড়ে থাকে ছুটি-ছাটায় সারাদিন তোমার কাছে।

তা কেন? আমরা কত জায়গায় ঘুরেও বেড়াই। আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে কত ভাল লাগতে পারত। তা, আমাদের জন্যে সময় কোথায়?

কার? ভাল লাগত, কার?

ধরুন, আমারই।

বৌদি বলল, তাই?

তা, বল কি খাবে? কিছু না খেলে কি চলে?

পূর্ণ বলল, কিছুই খাব না বৌদি। তাড়া আছে আজ। সত্যিই।

আবার কবে আসবে?

আর বোধহয় আসব না।

ব্যথার ছায়া পড়ল মুখে এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপর বলল, কেন? তোমার দাদার অসভ্যতার জন্যে?

না। সে জন্যে নয়। বিষাদের ভীরুতায়। আপনিও কি বাঁচতে চান না বৌদি? একটাই ত জীবন। সাহস করে বাঁচুনই না। বাঁচার মতন বাঁচুন।

ঝুমুর মুখ অপ্রতিভতায় লাল হয়ে যাওয়াতে, সে আরও সুন্দরী হয়ে গেল।

মুখ নামিয়ে নিল ঝুমু, পূর্ণর এই কথা শুনে।

বিষাদ, কথা ঘোরাবার জন্যে কথা কেটে বলল, শুনলে, পূর্ণ চলে যাচ্ছে গোপিনাথপুর ছেড়ে চিরদিনের জন্যে। তাই ওর সব সম্পত্তি আমাকে দান করতে এসেছে।

পূর্ণ, লক্ষ্য করল যে, "সব" এবং "সম্পত্তি" শব্দ দুটির উপরে বিষাদ বিশেষ জোর দিল।

পূর্ণ বলল, শুধু বিষাদকেই নয় বৌদি, আপনাকেও দিয়ে গেলাম। আপনাদের নতুন সংসারে আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

এবারে বিষাদ কুটিলমুখে বলল, আপনাদের সংসারে মানে? ও কথার মানে কি?

মানে, না বুঝলে আমি বোঝাবার প্রয়োজন দেখিনা কোনো। চলেই যখন যাচ্ছি, তখন আর ঝগড়া করা কেন?

ঝুমু বৌদি অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল।

পূর্ণ বলল, আপনার জন্যে আমার কষ্ট হয় বৌদি। বিষাদ না হয়ে, আমি যদি আপনার দেওর হতাম, তাহলে আপনাকে সত্যিকারের সুখী করার চেষ্টা করতাম।

সত্যিকারের সুখ?

বাক্যটার অবাস্তবতাতে যেন চমকে উঠল ঝুমু। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। চুপ করে, মাথা নুইয়ে নিল।

হ্যাঁ বৌদি। সত্যিকারের সুখ।

সেটা কেমন সুখ, পূর্ণ?

ঝুমু অবিশ্বাস আর একটু শ্লেষের সঙ্গে বলল।

যে-সুখকে আমরা ঘরে ঘরে সুখ বলে মেনে নিয়ে, নিয়ত নিজেদের সঙ্গে ভণ্ডামি করে যাচ্ছি, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ; সে সুখের অধিকাংশই সুখ নয় বৌদি। সে-সব মিথ্যে সুখ। অথচ সত্যি কি মিথ্যা, তা আমরা সকলেই জানি মনে মনে, কিন্তু স্বীকার করতে পর্যন্ত ভয় পাই। নানারকম ভয় আমাদের! তাই....

তোর ডায়ালগ শুনে মনে হচ্ছে, তুই যাত্রা-টাত্রা করছিস আজকাল। জীবনটা

যাত্রা নয় পূর্ণ। নাকি ইনকামট্যাক্সোর মোক্তার নসুবাবুর খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাত্রা দলেই নাম লিখিয়েছিস? তা, যাত্রাতে আজকাল রোজগার ত শুনি ফিল্ম লাইনের চেয়ে অনেকই বেশি। মন্দ কি?

একটুক্ষণ চুপ করে রইল পূর্ণ। সব কথার পিঠে তখুনি কথা বলতে পারা যায় না। বলা হয়ত উচিতও নয়। তারপর বলল, যাত্রা, জীবন থেকেই উঠে আসে বিষাদ। যাত্রার পাত্র-পাত্রীরা শুধু রং-চঙে পোশাক পরে থাকে, এই যা। এবং যাত্রাটাও কিন্তু বিবেক-রহিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তা নইলে, প্রায় প্রত্যেক যাত্রাতেই বিবেক চরিত্রটির আলাদা কোনো ভূমিকা থাকত না। এটা স্বীকার করিস নিশ্চয়ই তুই।

তা বলে, তুই যা বলছিস....

বিষাদ নিজের সঙ্গেই যেন নিজে ঝগড়া করে বলে উঠল।

পূর্ণ বলল, দ্যাখ বিষাদ, তোর সঙ্গে ঝগড়া আমি করব না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করিস, তুই সৎ কি না, সাহসী কিনা। উত্তেজনাতে মুখে কথা না জোগাতে পেরে, একটু চুপ করে থেকে বলল।

তুই ত খুব সাহসী! একেবারে কনসেপ্ট অফ কারেজ। যে কারণে, তুই আজ এ বাড়িতে দাদার কাছে এসেছিলি, সেই মুসলমান বাঈজীর মেয়ে, নাথু ভোগতার ঘরণী জগমগি সম্বন্ধে ভাবাভাবিটাও তাহলে শেষ করে যা। আয়নার সামনে নিজেকেও দাঁড় করা একবার। তোর আয়নাটাকে কোথায় ফেলে এলি?

বলেই বলল, তুই একটা হিপোক্রিট।

পূর্ণ উঠে পড়ে বলল, চলিরে। চলি বৌদি।

যেতে যেতে, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, পূর্ণ বলল, জানতেই যখন চাচ্ছিস, প্রসঙ্গটা ওঠালিই যখন; তখন বলি যে, নাথুদাদা জগমগির সঙ্গে একমুহূর্তের জন্যেও খারাপ ব্যবহার করেনা কিন্তু কোনদিনও। জগমগির সঙ্গে কোনরকম শারীরিক সম্পর্কও আমার হয়নি আজ অবধি। কিন্তু হয়ত হবে কোনদিন।

হবে?

বিষাদ বলল। কিন্তু এই এলোমেলো কথার মানে কি?

মানে নেই কোনো। কথাটা অত্যন্তই রেলেভেন্ট। আদৌ এলোমেলোও নয়। কনগ্রাচুলেশানস্। বিষাদ বলল।

একটু চুপ করে থেকে পূর্ণ বলল, জগমগি যে, বাঈজীর মেয়ে, এটা ঠিক। কিন্তু বাঈজীও ত স্বাধীন পেশারই মানুষ। নসুমোক্তার বা ঘোষাকিরই মতন। আমার তোর মতন চাকুরেত নয়। জগমগি যদি বাঈজী হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা

করতে পারত, তবে তাকে পাটনা ছেড়ে আসতেই হত না। তাছাড়া, জন্মসূত্রে মুসলমান হওয়াওত কোন দোষের নয়। যেমন জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়াও কোনো দোষের নয়। আসলে, জগমগি আর ঝুমু বৌদির মধ্যে কোন তফাৎ বিশেষ নেই। ওঁদের দুজনের কেউই স্বাবলম্বী নন। আর নন বলেই, নিরুপায়েই অন্যদের ভরসাতে তাঁদের থাকতে হয়।

তোর যদি এতই সাহস ত তুই সঙ্গে করে জগমগিকেও নিয়ে যা না। তবে ত বুঝি। নইলে, গুড অ্যাডভাইস আর ব্যাড এগজাম্পল দিয়ে লাভ কি?

নাথুদাদা ত ইংরিজি পড়েনি, বাংলা সাহিত্য পড়েনি ; ভাগ্যিস পড়েনি ; সে ট্রেজারীর দারোয়ান। পড়ার মধ্যে পড়েছে তুলসীদাস। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেই আমার-তোর চেয়ে বেশি শিক্ষিত। আমাদের চেয়ে অনেকই উদার। শিক্ষাটা জাহির করার ব্যাপার নয় আদৌ। জীবনে, নীরবে প্রয়োগ করার ব্যাপার। নাথুদার কাছেই শিখতে হল এই সত্যটা।

বলেই, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, চলিরে বিষাদ। ভাল থাকিস। চলি বৌদি।

বাইরে বেরিয়ে গিয়েও পূর্ণ ফিরে এসে বলল, আমি জগমগিকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি। তোরা বা তোদের সমাজ কে কি বলবি বা বলবে, তার অপেক্ষা না করে। বুঝেছিস। হিপোক্রিট আমি নই।

নাথু ভোগতা তার বৌকে ছেড়ে দেবে?

না দিলে, জোর করেই নিয়ে যাব।

তোর এত জোর?

জোর না খাটালে জানা যাবে কি করে, তোর জোরের চরিত্রটা? কার জোরের কী রকম?

ছিঃ! ছিঃ! লোকে বলবে কি? তুই একটা.....

পূর্ণ উত্তর দিল না কথার।

হাত তুলে বিদায় জানিয়ে, উঠোনে নামল। ওর মুখে রহস্যময় একটি হাসি ফুটে উঠল।

এখন বেলা দশটা হবে।

অন্যদিন হলে, এতক্ষণে ইনকামট্যাক্স অফিসের সেকশানে হয়ত বসে গল্প করত। পূর্ণ, নরেন, বংশী, অমিত, কার্তিকার সঙ্গে।

নয়ত, হাকিমদের সামনে বসে, খাতা দেখাত।

থোড়-বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। শীত পড়ে গেছে, এত সকালে হাকিমেরা

কেউই আসেন না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতটাই উপভোগের। তাছাড়া হাকিম হবার অনেকই সুবিধে এ দেশে। জনগণের সেবক নন এঁরা ; জনগণই তাঁদের সেবক।

কোনোদিন হয়ত এই সব ভুল। মান্ধাতার আমল থেকে বিনা প্রতিবাদে মেনে-আসা নিয়ম বদলাবে। একদিন। কিন্তু সেদিন কবে আসবে, জানে না পূর্ণ।

শিমুলতলির মোড়ে পৌঁছে অভ্যাসক্রমে ইনকামট্যাক্সের অফিসের দিকেই মোড় নিয়েছিল। পরক্ষণেই পথ ঠিক করে, সোজা চলল। এখন শুধু পূর্ণ আর জগমগি।

ঝিলমিল করছে পথের দুপাশের গাছের পাতারা। যেন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আত্মার অভিনন্দন। বিষাদের মতন শ্লেষের নয়।

রোদটা পড়েছে ঘাড়ের উপরে। প্যাক-প্যাক, প্যাকো-প্যাকো করে সাইকেল রিকশা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। পাশ দিয়ে, মাটিতে আর চাকায় ঝিরররর শব্দ তুলে সাইকেল আসছে যাচ্ছে। একটা দাঁড়কাক ডাকছে কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের পেঁপে গাছের মগডালে বসে।

নিজের অজানিতেই হঠাৎই খুব একটা দামী কথা বলে ফেলেছে পূর্ণ। এই কথাটা আগে কেন বলেনি, বা বোঝেনি যে, তা কে জানে। এই বিরাট বিশ্বে, এই বিরাট দেশে, রাধানগর আর গোপীনাথপুরের ইনকামট্যাক্সের জগৎটা, একমাত্র জগৎ নয়।

পৃথিবী মস্ত বড়। পূর্ণর পৃথিবীও। নসুমোক্তারের খিদমদগারী করে-খাওয়া ছাড়াও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে, সুস্থ জীবিকা অগণ্যই আছে। এই ছোট্ট, মাপা জগৎ এর বাইরেও মস্ত জীবন পড়ে আছে; হাজারীবাগের বিশ্বটাড়ের মতন।

নসুমোক্তার বা তার অন্য মুহুরীদের বাঁচার অন্য কোনো পথ বা রকম না থাকতে পারে ; কিন্তু পূর্ণর অনেকই আছে। অনেক ; অনেক।

রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে গরম হয়ে-যাওয়া বুকের মধ্যে, এই জানাটা জেনে, পূর্ণ, যেন পূর্ণতর হল।

মনে হল পূর্ণর।

ভাবল, হরিষদাদা বোধহয় জেনেশুনেই আজ তাকে ডেকেছিলেন "পূর্ণতম" বলে।

পথপাশের কোনো গাছে একটা তক্ষক টুক-টুক-টুক করে ডেকে উঠে বলল যে.......

গোপিনাথপুর স্টেশনে বসেছিল পূর্ণ আর জগমগি ট্রেনের অপেক্ষায়।

এখন সকাল আটটা। ঝকঝকে রোদের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম এর বেঞ্চে বসে ওদের সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া বহমান জগতের দিকে উদ্দেশ্যহীন কিন্তু তীব্র ঔৎসুক্যভরা চোখে চেয়ে রয়েছে ওরা দুজনে। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা। তাতে, কৃষ্ণচূড়া আর সোনাঝুরি গাছের পাতারা নাচানাচি করছে। রোদের কুচি ছিটকোচ্ছে পাতার আঙুলে। পাঁচটি শালিক অত লোকজনের ঐ যাতায়াতের মধ্যেই এক্কা-দোক্কা খেলছে। একটি লাল রঙা মাদী কুকুর মাঝে মাঝে তাদের তাড়া করে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তারা আবারও এসে বসছে।

একজন অন্ধ গায়ক, এক হাতে লাঠি নিয়ে, অন্য হাতটি একটি আট দশ বছরের ছেলের হাতে রেখে গান গেয়ে ফিরছে সকালের প্ল্যাটফর্মে।

"দো দিনকা জগমে মিলা
দো দিনকা.......
হিঁয়া চলাচলিকা খেলা
কোই চলা গায়া কোই যায়ে
কোই গাঁঠরি বাঁধ সিধায়ে
দো দিনকা, জগমে মিলা...."

কিছু কিছু গান থাকে, এমনই পথমাঝে হঠাৎ-শোনা, হঠাৎ-বোঝা ; কিন্তু পরে সেই সব গানই সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

মনটা উদাস হয়ে গেল পূর্ণর।

জগমগির দিকে তাকাল একবার। ওকে দেখে রীতিমত পুলকিত হল। মনে

হল, যেন এই নতুন এবং প্রথমবার দেখল ওকে। যদি ওদের বিয়ের মতন বিয়ে হত, সম্বন্ধ করে ; তবে যেমন শুভদৃষ্টির সময়ে দেখত। বুঝল যে, যে ঘরের মধ্যেই থাকে, বা চোখের সামনে, নিয়ত ; একা একা, যার সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বর কোনো প্রতিযোগী থাকে না, তার সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব বিচার করাটাই সম্ভব হয়না সে যতক্ষণ না বাইরে সকলের মধ্যে আসে।

এই প্ল্যাটফর্মে কত যাত্রী। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, কেউ ট্রেনের জন্যে ওদের মতন অপেক্ষা করছে। তাদের মধ্যে কত নারী। কিন্তু জগমগির মতন কেউই নয়। না, একজনও নয়। অন্ততঃ পূর্ণর চোখে।

একটা কমলা-রঙা জর্জেটের শাড়ি পড়েছে জগমগি। নীচে কমলা-রঙা শায়া। এই শাড়িটা বহুদিনের পুরনো। ওর মায়ের। পাটনা থেকে পালিয়ে আসার সময়ে নিয়ে এসেছিল। সকালে উঠে চান করেছে জগমগি খুব ভাল করে কাড়ুয়া তেল মেখে। দু চোখে সুর্মা দিয়েছে। অম্বর আতরের শিশিতে তলানি ছিল একটু, তাই সামান্য মেখেছে কানের লতিতে, স্তনসন্ধিতে, নাভিতে। এবং উরুসন্ধির সিঁথিতে, আলতো করে।

জগমগিও দেখছে পূর্ণকে। লম্বা, ফর্সা, দোহারা চেহারা, বড়া-খানদান এর বহত পড়ে-লিখে মানুষ সে। তার উপরে গান-বাজনায় পাকা। অশেষ ভাগ্য জগমগির যে, সে পূর্ণর সঙ্গে তার জীবনে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে। আজ সকালের পৃথিবীটাই জগমগির চোখে ভারী সুন্দর হয়ে গেছে। আরও সুন্দর হয়েছে অন্য কারণে। সে কারণটা ভারী অদ্ভুত। আবার স্বাভাবিকও।

নাথুদাদার যে-বৌকে নিয়ে সারেঙ্গীওয়ালা মুনাব্বর ভেগে গেছিল সে নাথুদাদার দাদার হাত ধরে ফিরে এসেছে নাথুদাদার কাছে। এবং গতকালই। কত আশ্চর্য সব ঘটনাই যে ঘটে। নাথুদার বউএর নাম বুধিয়া। তার মধ্যে শরীরজনিত যে চাওয়া বা অপূর্ণতা ছিল, তা মিটিয়ে এসেছে ও। একবার গর্ভবতী হয়েছিল। খালাস করে দিয়েছে মুনাব্বর, ওর আপত্তি সত্ত্বেও। সেই ঘটনার পর থেকে মুনাব্বরের উপরে তার ভীষণই রাগ। নাথুদার কাছে শরীরের সুখ পায়নি বটে, মনের শান্তি পেয়েছিল। তাছাড়া ইদানীং মুনাব্বর তার মদের পয়সা যোগাড়ের জন্যে অন্য মদমত্ত পুরুষদের নিয়ে আসত বুধিয়ার শক্ত-সমর্থ শরীরের লোভ দেখিয়ে। বুধিয়া চেঁচামেচি করত, অচেনা মানুষদের মারধোরও করত কিন্তু কোনো কোনোদিন সে বা তারা শুধু শরীরের জোরেই তাকে পরাস্ত করে তার শরীরটাকে নিয়ে একদল হায়নার মতন কামড়াকামড়ি করত।

তখন নাথু ভোগতার তুলসীমঞ্চওয়ালা, তুলসীদাসের দোঁহা সুর করে পড়া

শান্ত সন্ধেবেলাগুলোর কথা মনে পড়ত বুধিয়ার। বুধিয়ার মতন আনপড় মানুষও বুঝত, মানুষের মনটাই সব। সব না হলেও, শরীরের চেয়ে অনেকই বড়। এখানেই জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ।

বুধিয়ার মনে পড়ত, মুনাব্বরের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের শরিক হয়ে ; যে, বিয়ের পরে-পরেই নাথুদাদা তাকে শুনিয়েছিল ঃ

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্

সামান্যমেতাৎ পশুভিনরানাঃ

ধর্মহি তেষাম অধিকোবিশেষোঃ

ধর্মেনাহীনা পশুভিসমানাঃ।"

এই শ্লোক, কোথায় পড়েছিল নাথুদাদা, নাথুদাদাই জানে। তবে এ তুলসীদাসে নয়। উপনিষদ না কি, নাম বলেছিল। শ্লোকটার মানে হল, আহার ঘুম, ভয় আর মৈথুন এই চার মানুষেরও আছে, পশুরও আছে কিন্তু মানুষের ধর্ম আছে, যা পশুর নেই। আর যে মানুষের ধর্ম নেই, সে মানুষ মানুষই নয়।

এই ধর্ম, জাতপাত নয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান নয়, এই ধর্ম মনুষ্যধর্ম।

তারপর মনুষ্যধর্মের ব্যাখ্যা করেছিল নাথু ভোগতা। অত শত বোঝেনি বুধিয়া তখন, রুটি বানাচ্ছিল আর লাউকির তরকারী। তাছাড়া বিয়ের পরে পরের ঘটনা। কখন খেয়ে দেয়ে বিছানায় যাবে, তখন এই ছিল চিন্তা। সেই বিছানাতেই মোহভঙ্গ হওয়াতে অন্যের বিছানাতে গেছিল। সেবারের মোহভঙ্গ হতে, সন্তান পাবে না জানতে, সময় লেগেছিল অনেক। কিন্তু দ্বিতীয়বার মোহভঙ্গ হল বড় তাড়াতাড়ি। অন্য বিপদে পড়েছিল বুধিয়া। তার যৌবন ফুরোতে বাকি ছিল তখনও অনেক। মুনাব্বর তাকে এক মাউসীর কাছে বিক্রী করে দিয়ে গয়া পালিয়ে যাবার ধান্দা করছিল। গয়াতেও অনেক বাঈজী এখনও আছে- সেখানে সারেঙ্গীওয়ালার কাজ জুটলেও জুটতে পারত। বেনারসে নানারকম ধান্দা করে দিন গুজরান হত মুনাব্বরের। ডাল কা মণ্ডির গলির আর সেই রমরমা নেই। গান-বাজনার রসিকবাবুরাও সব মরে গেছে। সূক্ষ্ম কোনো ব্যাপারের জন্যেই সময় নষ্ট করতে রাজী নয় কেউই। শুধুই বাজানেওয়ালি তবায়েফদের কদর এখন। গানেওয়ালিদের কেউ চায় না। আর বাজানেওয়ালিরা সারেঙ্গী দিয়ে কি করবে। তাদের দুই মুখই যথেষ্ট। তারা বলে, "মু" আর "চু"।

পূর্ণ ভাবছিল, তার আর জগমগির বেরিয়ে পড়ার আগের দিনই যে নাথুদার পুরনো স্ত্রী বুধিয়া ফিরে আসবে, এটা একটা ঐশ্বরিক ঘটনা বলতে হয়।

জগমগিকে খুশি করতে পারেনি বলে যে অনুতাপ ছিল নাথুদার, তা ধুয়ে গেছে জগমগিকে পূর্ণর হাতে তুলে দিতে পেরে। মন থেকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে নাথু ভোগতা।

পূর্ণও খুশি হয়েছে, হয়েছে জগমগিও ; বুধিয়াকে ফিরে পেয়ে নাথুদার আনন্দে। বুধিয়াকে বলেছিল নাথুদা গত রাতে, অড়হড়কা ডাল পাকানারে বুধিয়া, জারা হিং ডালকে। তোর হাতের অড়হড় এর ডাল বহুদিন খাইনি। বড় ভাল রাঁধিস তুই।

জগমগি হেসে বলেছিল, তোমার মরদ কেমন রোগা হয়ে গেছে দেখেছ বুধিয়া দিদি। না খেতে পেয়েছে অড়হড় ডাল, না অন্য কিছু। তোমার যা যা স্বাদু জিনিস আছে সব খাইয়ে তাড়াতাড়ি মোটা কর নাথুদাদাকে।

বুধিয়া লজ্জা পেয়ে, বাঁ হাতে আঁচলটাকে ধরে, 'ধেৎ' বলে আঁচল দিয়ে মুখ আড়াল করেছিল।

ওদের চার ঘরে রীতিমত উৎসব পড়ে গেছিল। বনবিহারীবাবুর স্ত্রী এক পোয়া পাঁঠার মাংস আনিয়ে ঝোল-সমুদ্র আর আলুর লাইটহাউস দিয়ে, জগমগি আর পূর্ণকে রাতে খাইয়েছিলেন। অবস্থা কার কেমন, সেটা বড় কথা নয় ; মনটা, আন্তরিকতাটাই বড়।

গোপিনাথবাবুর মা কাশতে কাশতে পায়েস রেঁধেছিলেন নলেন গুড়ের। বনবিহারীবাবুর ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটা কি ঘটল ঠিক বোঝেনি, তবে প্রচুর ঝোল, আলু ও মাংসের গন্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে খুশি হয়েছিল খুবই।

কাল রাতে নাথু দাদা শুয়েছিল পূর্ণর ঘরে আর বুধিয়া জগমগির সঙ্গে।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে!

ভাবছিল পূর্ণ।

কারো মুখে শুনলেও হয়ত বিশ্বাস করত না।

পূর্ণ বলল, চা খাবে?

চা?

জগমগি বলল।

এই ত খেয়ে এলাম।

সে ত বাড়িতে। স্টেশানের মাটির ভাঁড়ের চায়ের স্বাদই আলাদা।

চায়ে গরম। চায়ে গরম করে একজন রিটায়ার্ড কুলি চা ফিরি করছিল। তার বাড়ি নাকি দারভাঙ্গায়।

এদিকের সব রেলস্টেশানের যত কুলি সবই কি দারভাঙ্গা জেলা থেকে

আসে?

ভাবছিল পূর্ণ।

বলল, খাও, চা খাও।

জগমগি চা খাচ্ছিল। পূর্ণও সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাঁড়ের চা খেতে খেতে বলল, এখন যদি পাটনার কেউ তোমাকে দেখে ফেলে? যদি বলে, বাঈ না?

বললেই বা কি? তুমি ত আমাকে সতীলক্ষ্মী জ্ঞানে গ্রহণ করোনি। আমি যা, আমি তা জেনেই তুমি। কি? তাই নয় কি?

আচ্ছা, এই সতীলক্ষ্মী ব্যাপারটা কি বলত?

পূর্ণ বলল।

আমি কি করে বলব। এ ত মুসলমানদের জবান নয়, হিন্দুদেরই কথা। আসলে হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, মেয়েদের চিরদিনই সতীলক্ষ্মী করে রাখতে চায়। বৌরা সতীলক্ষ্মী আর নিজেরা খোদার ষাঁড়। যা কিছু করতেই তাদের মানা নেই। তুমি দেখো, একটা দিন আসবে, যখন পুরুষদের এই ভন্ডামির মুখোস সারা পৃথিবীর মেয়েরা ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে ; বিশেষ করে আমাদের দেশে।

দিলে দেবে। তুমি ত আমার সতীলক্ষ্মী। তাহলেই হল।

হাসল, জগমগি।

বলল, ভাল করে সাবান দিয়ে চান করে এলেই যদি অসতী আবার সতী হয়ে যেতে পারে তবে এই নিয়ে কারা এবং কেন যে চিরদিন এত হল্লা মাচিয়ে এল, তা কে জানে!

ট্রেনটা একঘন্টা লেট। ওরা এখান থেকে শেয়ালদা যাবে। তারপর হাওড়া হয়ে গোমো। গোমোতে পূর্ণদের পরিবারের এক পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী ক্ষেতি-জমিন করে আছে। তোপচাঁচি লেক এর কাছেই। হামিদ মিঞা। হাজারীবাগে ছাড়োয়ার দিকে ওদের যে ক্ষেতিজমিন ছিল তাই দেখাশোনা করতো হামিদ চাচা। খুব ভালবাসতো পূর্ণকে।

জানেনা, চাচা বেঁচে আছেন কি না।

গোমো জায়গাটা, নিরিবিলি, আর হামিদ চাচার ক্ষেতি ত আরওই নিরিবিলি। তিনকামরার বাড়ি আছে একটা। লাটাখাম্বা। এখন মটরছিম্মি, ফুলকপি, কাড়ুয়া অথবা সরগুজা লেগেছে নিশ্চয়ই। নতুন আলু। জগমগিকে নিয়ে তোপচাঁচী লেকের চার ধারের পথ দিয়ে হেঁটে বেড়াবে। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে প্রকৃতির বুকের কোরকের আড়ালে, জগমগির বুকের খাঁজে, কানে চুমু খাবে। প্রথম দাড়ি

কামানোর দিন থেকে যত অবদমিত কাম জমা হয়েছে তার সবটুকুকে পাহাড়ী ঝোড়ার মতন বইয়ে দেবে জগমগিকে ভিজিয়ে দিয়ে।

সে ত কিছুই জানেনা। জগমগি শিখিয়ে নেবে।

একটা চিন্তা আছে পূর্ণর। সেটা হচ্ছে, হামিদ চাচা কট্টর মুসলমান। প্রত্যেকটি নামাজ অদা করে। রোজা রাখে। হামিদ চাচা অথবা তিনি বেঁচে না থাকলেও তাঁর বড় ছেলে খইরুল মিঞা, জগমগির সঙ্গে পূর্ণর জোড় হলে তাকেই কলমা পড়ে, মুসলমান হয়ে যেতে বলবে। না হলে, নিকাহ করতে দেবে না। ওঁরা এমনই কট্টর যে, জগমগিকে জবরদস্তী করে ধরে রেখে অন্য মুসলমানের সঙ্গে বিয়েই দিয়ে দেবেন হয়ত। দুসরা বা তিসরি বিবি হয়ে থাকবে জগমগি। জগমগিকে দেখলে, খইরুল মিঞা নিজেও বিয়ে করতে চাইতে পারে।

উচ্চ-শিক্ষিত-মনা জ্ঞানী গুণী হিন্দু পুরুষ বা নারীদেরও, যাঁরাই মুসলমান মেয়ের বা ছেলের প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চেয়েছেন তাঁদের ; তাঁদের প্রত্যেককেই মুসলমান হতে হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত সমাজেও যে এমন হয়েছে তা জানে বলেই, পূর্ণর ভয় করছে। ও মনে মনে ঠিক করল, গোমোতে যাবে না, হাজারীবাগ রোড পেরিয়ে কোডারমাতে নেমে, হয় বাঁয়ে ঝুমরী-তিলাইয়া নয় ডাইনে শিবসাগর-ডোমচাচে চলে যাবে। বাবার জানাশোনা একজন ছিলেন ক্রিশ্চান মাইকাতে। নয়ত রাজঘড়িয়া বা সামন্তদের কাছেও খোঁজ করবে। ভাল অ্যাকাউট্যান্ট এই সব ছোট খাট জায়গাতেও চট করে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ও ত ইনকামট্যাক্সের কাজও জানে। অ্যাডেড কোয়ালিফিকেশন।

জগমগি যেন মনের কথাটা বুঝতে পারল পূর্ণর।

বলল, নসু মোক্তারের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে আবারও তুমি ঐ কাজই করবে।

না, করব না। কিছুদিনের জন্যে করব। নইলে তোমাকে খাওয়াব কি?

আমাকে খাওয়ানোর চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি প্ল্যাটফর্মে বা গাছতলায় বসে কাওয়ালি গাইলেই যা পাব তাতে আমাদের দুজনের চলে যাবে। তুমি গান করবে, সুর বাঁধবে, নতুন নতুন রাগ বানাবে আর আমি তোমাকে চোখের সামনে দেখব।

তবলচি কোথায় পাবে?

সবই যোগাড় হয়ে যাবে। সুর যাদের মধ্যে আছে তারা ফুলের মধুর গন্ধে যেমন মৌমাছি উড়ে আসে, তেমনি করে উড়ে আসবে আমাদের কাছে। তুমি দেখোই না।

বলেই, হঠাৎ বলল, আচ্ছা, কি ব্যাপার বলত? তোমার নসু মোক্তার ত কই আর এলো না, তোমাকে বাধা দিল না ; তোমার নতুন সাইকেল-টাকা সেসবও কিছুই ত দিল না।

টাকা ত, যা পাওনা, তার চেয়ে বেশিই দিয়েছে। সে জন্যে নয়। কিন্তু আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল না যে, সেইটেই খুব রহস্যের ব্যাপার।

জগমণি বলল, একটা লোক এসেছিল গুন্ডা মতন। এসে জিজ্ঞেস করল তোমার কথা।

কখন?

অবাক হয়ে বলল পূর্ণ।

তুমি যখন বাথরুমে গেলে।

তাই? কেমন দেখতে?

গুন্ডারা যেমন হয়। আমার দিকে খারাপ চোখে চাইল। লাল রক্তজবার মতন চোখ।

ধ্যাৎ। ওসব তোমার মনের ভুল।

আচ্ছা এই স্টেশানে তোমাকে বা আমাকে একজনও চেনে না, না?

কি করে চিনবে? তুমি এবং আমি আলাদা আলাদা এসেছি, যখন গোপিনাথপুরে আসি। আমি ত গাড়িতে এসেছি। কলকাতা যাব বলেই না এখানে এলাম।

তা বটে। সেই জন্যেই চিন্তা।

কিসের চিন্তা?

নাঃ। অন্য কথা বল। আর শোনো, টিকিট ফিকিট কাটতে যেতে হবে না।

সে কি? কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে নাকি? তাহলে লেখাপড়া শিখে লাভ হল কি? কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ। তোমার যত বাড়াবাড়ি। কত শিক্ষিত বড়লোক টিকিট চেকারদের ঘুষ-ঘাষ দিয়ে রোজ যায়। পাটনাতেও যেত। আমি জানি।

হয়ত যায়। তাই দেশের অবস্থা আজকে এমন হয়েছে। যারা অমন করে, তারা শিক্ষা পায়নি, মরা-খাসীর পেছনে যে ছাপ থাকে মিউনিসিপ্যালিটির, তাই পেয়েছে।

ঠিক আছে। তবে তুমি টিকিট যখন কাটতে যাবে, তখন আমাকেও নিয়ে যাবে। একা রেখে যাবে না।

তোমার কি হয়েছে বলত জগমণি?

জগমগি তার মুখটা পূর্ণর ডান বাহুর সঙ্গে চেপে, দুবার ঘষে বলল, ম্যায় বহত ডরতি হুঁ। ম্যায়, ইক বদনসীবী আওরৎ। হামারা আজাদীকি বড়ি সখ থী। এখন তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যখন সত্যিই স্বাধীন, মুক্ত, আলো-হাওয়ার, গান -বাজনার জীবন ছুকতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই আমার কেন এমন ভয় করছে গো? কারা যেন, আমাকে দেখছে। তোমাকেও। হয় তোমাকে খুন করবে ওরা, নয় আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

কেন ধরে নিয়ে যাবে?

মেয়েদের যে জন্যে পুরুষেরা ধরে নিয়ে যায়, কেন আবার কি? বেশ ছিলাম নাথুদাদার আর গোপিনাথবাবুর, অবিনাশবাবুর আর তোমার আশ্রয়ে। বস্তীতে ছিলাম বটে। কিন্তু বড় সম্ভ্রান্ত বস্তী ছিল যে।

কি যে, যাতা বল।

এমন সময়ে ঘন্টা বাজল।

চল, সঙ্গে যাবে ত চল। টিকিট কাটতে যাব এখন।

চল।

বলে, বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে এদিক ওদিক চাইল।

পূর্ণ বলল, হারমনিয়ম আর তানপুরাটা কি করে ফেলে যাব? তার চেয়ে একজন কুলি ঠিক করে, তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে রেখে যাচ্ছি।

কুলি? কুলি মাল পাহারা দিতে পারে। আমাকে কি করে পাহারা দেবে? না, না, তুমি জানোনা, আমার মনে বড় কু ডাক দিচ্ছে। আমাকে নিয়ে চল।

বেশ, চল।

পূর্ণ একজন হাট্টাকাট্টা কুলি দেখে তাকে হারমনিয়ম তানপুরার পাহাড়াতে রেখে জগমগিকে নিয়ে চলল টিকিট ঘরে।

টিকিট ঘর ফাঁকাই। জগমগির কথাই ঠিক। দেশ স্বাধীন হল বটে অনেকইদিন দেশের মানুষের আত্মসম্মানজ্ঞান হলনা। কোট-প্যান্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ইংরিজি বাংলা ফুটোনো মানুষগুলো, নইলে বিনা - টিকিটে ট্র্যাভেল করতে পারত না। আত্মসম্মানবোধ, দেশাত্মবোধ, এসবই বইতে লেখাই থাকল, অভিধানে, জব্দ হয়ে।

বড় লজ্জা করে পূর্ণরও এ কথা ভাবলে। যদিও ও বি কমও নয়।

টিকিট কেটে ফিরে এল। দুজনের কাঁধে দুটি ঝোলা। তাতেই সমুদয় সম্পত্তি।

তোমার গানের ক্যাসেট, ছবি আঁকার রঙ তুলি, সেগুলো বিষাদদাকে দিয়ে

এলে কেন? সবই দিয়ে দিলে, তোমার যে কিছুই থাকল না।

কে বলে। আমার যে জগমগি রইল। হাত খুলে দিতে না জানলে, কি হাত ভরে পাওয়া যায়?

ওরা বেঞ্চে বসতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ নসু মোক্তারের গলা পেল পেছন থেকে ।

এই যে পূর্ণ!

চমকে চেয়ে দেখল, পাশে হরিষদা দাঁড়িয়ে।

হরিষদা হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, কনগ্রাচুলেশনস্।

তুই করে দেখালি বটে যে, করা যায়।

কি? কি করে দেখাল?

পূর্ণ বলল, জগমগিকে। প্রণাম করো। বিষাদের দাদা। হরিষদা। মোক্তারবাবুকে ত তুমি চেনই।

জগমগি প্রণাম করল বটে কিন্তু ওর পূর্ণশশীর মতন মুখটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

হরিষদা বলল, বিয়ে নয়, বিয়ে নয় নসুবাবু। বিয়ে করার মতন সহজ কর্ম এদেশে আর দ্বিতীয় নেই। কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, আকাট সব পুরুষই এখানে বিয়ে করতে পারে। করার মধ্যে তাদের ত ঐ একটাই কাজ।

তবে? কিসের কথা বলছেন আপনি?

এই বাঁধন-ছেঁড়ার কথাটা। আপনি বুঝবেন না নসুবাবু। আপনি জাত মোক্তার। আর আমি কম্প্যারেটিভ লিটারেচারের ছাত্র। কেন যে এই ডিপার্টমেন্টে এলাম। টাকার জন্যে? একটা মিনিমাম রিকুয়ারমেন্ট মিটে গেলে টাকা দিয়ে কি হয়? লো-লিভিং হাই-থিংকিং এ চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছি আমি। অথচ সেই আমারই, আমার জীবনের উপরে এখন কোনো কন্ট্রোলই নেই। স্টিয়ারিং কেটে গেছেরে পূর্ণ। হালভাঙ্গা নৌকো আমি। তোর বৌদির, তোর বন্ধুর অর্ডার সাপ্লায়ার। তোর বন্ধু একটা ভণ্ড পূর্ণ। তুই নোস। নিজে স্কুল মাস্টারীর গর্বে বেঁকে থাকে আর আমার উপরি-রোজগারের টাকায় যতরকম ফূর্টুনি সব করে। আবার আমারই শ্রাদ্ধ করে তোর কাছে, তোর বৌদির কাছে। সত্যি বলছি পূর্ণ। প্রায়ই ইচ্ছা করে, দুস্‌স শালা। চাকরী মাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাই হিমালয়ে। আছেটা কি আমার জীবনে? নিজের আমার চাহিদাটাই বা কতটুকু।

তা, গেলেই ত হয়।

বলে, নসুবাবু সজোরে দুনাকে নস্যি নিলেন।

সেইটাই ত কথা নসু বাবু। সেইটাই ত সবচেয়ে কঠিন কাজ। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছি আমরা। অথচ যা কিছু, বা যে, বা যারা বেঁধেছে, তাদের আমার আপনার জন্যে এককণা ফীলিং নেই। শুধুই টাকা। আন টাকা। আন টাকা। আন টাকা।

চলে যান তাহলে আপনিও। নসুবাবু বললেন।

সেইটাইত কথা নসুবাবু, সেইটাই ত কথা। বলা সোজা। করা সোজা নয়। ভাগ্যিস আপনি আই. এ. সির পাটা টেপালেন ওকে দিয়ে। অফিস শুদ্ধ লোক পেছনে লাগল। আসলে সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। পূর্ণ ভিতরে ভিতরে বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল অনেকইদিন ধরে। তা আমি লক্ষ করেছি।

তারপর, থেমে বলল, কিন্তু এটা সম্ভব করলি কি করে? পূর্ণ?

পূর্ণ, জগমগির দিকে দেখিয়ে দিল তর্জনী দিয়ে।

জগমগি সজোরে মাথা নাড়াল দু দিকে।

বলল, না, না, আমি নই, আমি কিছুই নই ; ওর ভিতরে যে গান আছে সেই গানই ওকে এই বাঁধন ছেঁড়ালে।

পূর্ণ বলল, জানেন, হরিষদা, একদিন হঠাৎই মনে হল এই পৃথিবীটা, এই জীবনটা, এই বাবুর মাঠের সামনের পোড়ো লাল বাড়িতে, ঐ ইনক্যামট্যাক্স অফিসটার চেয়ে, অনেক, অনেকই বড়। ওর মধ্যে আটকে থাকাটা ঠিক নয় ....মানে....

বুঝেছি রে বুঝেছি। আমি একদিন হাকিম হব। তারপর হয়ত রিটায়ার করার আগে আই: এ. সি.ও। যেহেতু ইনকামট্যাক্সে কাজ করি, পুলিশেরই মতন ঘুষ না খেলেও, লোকে বলবে ঘুষ খায়। হাতে ইলিশমাছ নিয়ে বাড়ি ঢুকলে, যে-আত্মীয় সেই মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে গেল, সেই শালাও টাগরা দিয়ে টাক করে আওয়াজ করে বলবে, চোখ নাচিয়ে ; ঘুষের টাকার মাছ। শালাদের চোখ গেলে দিতে ইচ্ছে করে। তারপর একদিন আউট অফ শিয়ার ডিসগাস্ট সৎ মানুষও ঘুষ খাবে। আর শালা, খাবেই বা না কেন? যে দেশের বড় বড় মন্ত্রীদের নামেও ঘুষ খাবার অভিযোগ ওঠে, যে দেশের এম. এল. এ. এম. পি. রা অধিকাংশই ঘুষের দালাল ; সে দেশে, শালার ইনকামট্যাক্স বা সেলসট্যাক্স বা পুলিশের দোষটা কি?

নসু মোক্তার বললেন, ট্রেন এসে যাবে। বক্তৃতা হ্রস্ব করুন হরিষবাবু।

হরিষদা বললেন, তা তোরা খাবি কি করে? করবিটা কি?

গান গেয়ে।

গান গেয়ে?

আরিশশালা। হোয়াট আ গ্রেট আইডিয়া। বাঁচ বাঁচ। জীবনে এমন নতুন নতুন মোড় নে, নতুন নতুন ঘাসবনে যা, পাহাড় তলিতে ; নাচ তোরা নাচ. গা, নেচে নেচে বাঁচ। তোদের আমি প্রণাম করি। বলেই। নীচু হল হরিষদা।

পূর্ণ আর জগমগি ধরে ফেলল।

পূর্ণ বলল, কি করছ হরিষদা?

কেন করছি, তা তুই বুঝবি নারে পূর্ণ। আমরা জার্মানীর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে ছিলাম। আমি, তুই, নসুবাবু। ফরচুনেটলি ; নসুবাবুর এই পরাধীনতা বোধটাই নেই। বেঁচে গেছেন জোর। আজ ফটক খুলে তোকে মুক্তি দিয়ে দিল কম্যান্ডার আর আমরা তারের বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি যে, তোরা চলে যাচ্ছিস। মুক্ত, মুক্ত ; চলে যাচ্ছিস নতুন দেশে...আঃ।

বলেই, পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে জগমগিকে দিয়ে বলল, রাখো বোন এটা। আড্ডির দোকান থেকে তাড়াতাড়িতে কিনে আনলাম। তোমার পছন্দ হবে কিনা জানিনা। হার আছে একটা। ওর পছন্দ হল কিনা, জানিয়ে, চিঠি লিখিস পূর্ণ।

পূর্ণ অভিভূত হয়ে বলল, হুঁ।

নসু মোক্তার বললেন, তুমি আমার ডানহাত ছিলে বাবা পূর্ণ। কথাটা হয়ত নিজস্বার্থে স্বীকার করিনি কখনও। তুমি চলে গেলে, আমার খুবই কষ্ট হবে। তার ওপরে ঐ হারামজাগা ঘোবাকি। 'গুড-হিউমার' মাস্টার।

একটু থেমে বললেন, যাওয়া নেই, এসো। তবে এটা জেনে যাও যে, তোমার জন্যে আমার দরজা খোলা রইবে চিরটা কাল। আর, এই নাও ; তোমাদের পাথেয়। তুমি আমাকে অনেকেই রোজগার করে দিয়েছ বাবা। কত টাকা যে, তা তুমি কখনও জানতেও পারোনি।

তারপর, গলা নামিয়ে বললেন, এই খামে পাঁচ হাজার টাকা আছে। সাবধানে রেখো। পকেটমার না হয়।

আবার ঘণ্টা পড়ল।

ট্রেন আসছে।

হরিষ বলল।

ট্রেন আসছে। তোমাদের উঠিয়েই দিয়ে যাই তবে।

নসু মোক্তার বললেন।

তারপর বললেন, আমার কথা মনে রেখো।

বিয়েটা কবে? খাওয়াবিনা?

হরিষদাদা বললেন।

পূর্ণিমার রাতে মালাবদল করে হবে, শরৎবাবুর "পরিণীতার" মতন।

ও! তাহলে খাওয়াটা পূর্ণিমার রাতের হাওয়া দিয়েই সারলি প্যানা? মহা চালু ছেলে তুই!

ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ।

নসুমোক্তার এবং হরিষদা, যতক্ষণ ওদের দেখা যায়, ততক্ষণ হাত নেড়েছিলেন।

পূর্ণর মনটা হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের জন্যে খারাপ হয়ে গেছিল। নসু-মোক্তারের কাছেও সে ঋণী। ভাল বা মন্দ, মালিক বা কর্মচারী, প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের ঋণ কিছু থাকেই। এবং নিতান্ত কৃতঘ্ন না হলে, সেই ঋণ প্রত্যেক মানুষেরই স্বীকার করা উচিত। অনেককিছু শিখেওছে ও নসুমোক্তারের কাছে। ওঁর কড়াকড়ি, আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়ে নেওয়ার কারণেই, পূর্ণ শিখেছে এত।

তবে, এই মুহূর্তে ; ট্রেনের জানালার পাশে, জগমগির কাছে বসে ওর মনে হচ্ছিল যে, যা-কিছুই শিখেছে এতদিন, খাতা-লেখা, ইনকামট্যাক্সে খাতা দেখানো, ইনকামট্যাক্সের মারপ্যাঁচ ; সবকিছুকেই শ্লেটএর লেখার মতন মুছে ফেলে, এক আনকোরা নতুন জীবনে, সত্যিই সুস্নাত, সুগন্ধি হয়ে প্রবেশ করবে। দ্বিজ হবে ও। ব্রাহ্মণ না হয়েও, ব্রাহ্মণ হবে। কিন্তু পারবে ত শেষ অবধি? যদি জেদ বজায় না রাখতে পূর্ণ যাবে শেষ পর্যন্ত? যদি আবারও কোনোদিন নসুমোক্তারের কাছেই ফিরে আসতে হয়, মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হয় জগমগির এবং হয়ত অনাগত সন্তানেরও হাত ধরে? তাদের, তার, ভরণ-পোষণের জন্যে? জীবিকার প্রার্থী হয়ে?

যদি হয়, তবে লজ্জাতে মুখ দেখাতে পারবেনা ও। জগমগিকেই বা কি করে মুখ দেখাবে? না না,। আজকে এই সুন্দর সকালে এসব লজ্জাকর ভাবনা ও ভাবতেও চায় না।

হরিষদা মানুষটাকে দেখে ; মানে, তার এই অন্যরূপ দেখে, পূর্ণর যে ঘোর

লেগেছিল ; তা এখনও কাটেনি। সত্যি। একজন মানুষের মধ্যে যে কতজন মানুষই থাকে। আর কোন সময়ে যে তাদের মধ্যে কোনজন বাইরে এসে তার নতুন, অন্যের-অদেখা মুখখানি নিয়ে দাঁড়ায়, অন্য সত্তাকে আড়াল করে ; তা একমুহূর্ত আগেও যদি বোঝা যেত একটুও।

জগমগি বলল, কি ভাবছ?

নাঃ পূর্ণ, প্রায় স্বগতোক্তির মতন বলল।

আমি জানি, তুমি কি ভাবছ।

জগমগি বলল।

কি ভাবছি?

ভাবছ, আমাকে নিয়ে কি করবে? কোথায় যাবে? সত্যি সত্যিই দুজনের চলবে কি না শুধুই গান গেয়ে? তুমি ভাবছ, আমি একটা বোঝা। ভাবছ, আমি একজন অপয়া মেয়েমানুষ।

হাসল, পূর্ণ।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই কি মনে হওয়ায়, সে চারখিলি পান কিনেছিল। জগমগিকে সে পান খেতে দেখেছিল দু একদিন। এই তার প্রথম উপহার তার জীবন-সঙ্গিনীকে, যতই সামান্য হোক না কেন তা। চারমিনারের সিগারেটের ফাঁকা বাক্সর মধ্যে সিগারেটের মোড়কে মোড়া মোটা কাগজ থেকে বের করে দুখিলি পান জগমগিকে দিয়ে, নিজে দুখিলি নিল। জর্দাও নিয়েছিল একটু। সমারোহ সহকারে, ট্রেনের জানালা দিয়ে আসা হু-হু হাওয়া আর হাহা-আওয়াজের মধ্যে একটু জর্দা মুখে ফেলতে গেল।

কিছুটা পড়ল খোলামুখে, আর কিছুটা উড়ে গেল।

তা দেখে, হেসে উঠল জগমগি। সেও নিল জর্দা। এবং বেশ তারিয়ে তারিয়ে পান চিবোতে লাগল। জর্দার খুশবু উড়ল।

বাব্বা! তুমি যে দেখছি বাহাদুর!

হেঁচকি তুলতে তুলতে পূর্ণ বলল।

জর্দাশুদ্ধু পানের পিক গিলে জগমগি বলল, বাহাদুরীর এখনই কি দেখলে? আমার কত কিছু বিদ্যা আছে জানা। শরীর মনের নিত্যনতুন বাহাদুরীতে তোমাকে চমকে দেব আমি।

তাই?

পূর্ণ বলল।

পূর্ণর রুচি খুব সূক্ষ্ম। মাঝে মাঝেই শরীরের প্রসঙ্গ আসে জগমগির কথাতে, হরিষদাদার মতন। তাতে ধাক্কা খায় পূর্ণ। শরীর ত আছেই, থাকবেই ; কিন্তু তা আগল-তোলা ঘরের বিষয়, এমন এক আকাশ আলোর মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করলে, ওর অস্বস্তি হয়। অবশ্য এটা ও মানে যে, জগমগির জীবনে শরীরটার

ভূমিকা খুবই বড় এবং শরীর-সর্বস্ব পরিবেশেই কেটেছে ওর ছেলেবেলা, তাই ওকে ক্ষমা করাই শ্রেয়। তাছাড়া, ও গড়ে নেবে জগমগিকে নিজের মতন করে। এখনও জীবনের বেলার অনেকই বাকি আছে।

জগমগি, মুগ্ধ দৃষ্টিতে, পূর্ণর তীক্ষ্ণ নাক, আগুনের মতন রঙ, এবং বাতাসে এলোমেলো হওয়া তার মাথাভর্তি, সামান্য খয়েরী-ঘেঁষা চুলের দিকে চেয়েছিল। মনে মনে বলছিল, সে কী সৌভাগ্যবতী। তার মতন একজন বাঈজী-তনয়ার যে এমন বড়া-খানদানের ভাল মানুষের সঙ্গে কোনোদিন রিস্তা হবে, তা কি ও স্বপ্নেও ভেবেছিল? পূর্ণ, ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে দিয়ে মাটির ঘরে থাকত বটে কিন্তু তার সম্ভ্রান্ততা সে লুকোতে পারত না। প্রেম এবং ঈর্ষারই মতন, সম্ভ্রান্ততা এবং নীচতাও লুকিয়ে রাখা যায়না সম্ভবত। তা প্রকাশ হয়ে পড়েই। যত মলিন পরিবেশেই তা ঢাকা পড়ুক না কেন, চাপা তা কখনওই থাকে না।

পূর্ণ ভাবছিল, নাথুদাদার কথা। বড় আশ্চর্য মানুষটা। তার স্ত্রী, বুধিয়ার ফিরে আসাটাও, এবং যে সময়ে পূর্ণ জগমগিকে নিয়ে চলে আসবে ভাবছিল, ঠিক সেই সময়েই তার ফিরে আসাটা কম আশ্চর্যর ব্যাপার নয়। সত্যি। সংসারে কত কিই না ঘটে। বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে তার ব্যাখ্যা চলে না।

জগমগি আবার বলল, কি ভাবছ তুমি আবার?

ভাবছি.......

বলেই, পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি কি ভাবছ? জর্দা খাওয়া কি অভ্যেস আছে নাকি?

ছিল বইকী! বাইজীর মেয়ের জর্দা খাওয়ার অভ্যেস থাকবে না, নাত কার থাকবে? তবে ঠিক করেছি, পুরনো সব অভ্যেসই ছেড়ে দেব এক এক করে।

তবে, থাকবে কি নিয়ে?

কেন?

ঝকমক করে উঠে জগমগি বলল, আমার নতুন অভ্যেসকে নিয়েই থাকব।

সেটা কি?

তুমি।

ট্রেনের কামরাতে মানুষজন ছিলই না বলতে গেলে। ভীড় হবে, বড় জাংশান নাটাগাছিতে। তাছাড়া, এই কামরাতেই সম্ভবতঃ চেকার উঠবেন। বিনা-টিকিটের যাত্রীরা, মনে হচ্ছে সেটা জেনেই ; এই কামরা বর্জন করেছেন। নইলে, কামরা এতটা ফাঁকা থাকার ত কথা ছিল না দিনের এই সময়ে। তবে, ভালই হয়েছে। পূর্ণ আর জগমগি নিজেদের মতন নিরিবিলি হয়ে কথা বলতে বলতে যেতে পারছে।

জগমগি বলল, উৎসুক গলায়, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

জগমগির মুখে সবসময়েই একটি হাসি ওর সৌন্দর্যর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে

থাকে। সেই হাসিটুকুও তার সৌন্দর্যর অঙ্গ।

শিয়ালদা। পূর্ণ বলল।

কখন পৌঁছব?

বিকেল বিকেল।

তারপর?

তারপর, রাতটা কোথাও কাটিয়ে, কাল সকালের কোনো গাড়ি ধরব হাওড়া থেকে।

রাতে নেই গাড়ি?

অনেকই আছে। কিন্তু সে সব গাড়িই ত গোমো কিংবা কোডারমাতে পৌঁছবে মাঝরাতে। আমি ত মন্ত্র পড়ে, লোক খাইয়ে বিয়ে করে, আগে জানিয়ে কোথাও যাচ্ছি না যে, উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, আমাদের জোড়ে বরণ করবার জন্যে সেজেগুজে আত্মীয়-পরিজনেরা দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার যে, কোনো রক্তের আত্মীয়ই নেই, এই বিপুল বিশ্ব-সংসারে। তোমারও হয়ত নেই। আমাদের মিল হয়েছে ভালই।

মাঝরাতে নামলে কি হবে?

সুন্দরী জগমগিকে নিয়ে মাঝরাতে কোথাও নামাটা কি ঠিক হবে? তুমি আমার অনেকই কষ্টের ধন। তাছাড়া, কোথায় গিয়ে উঠব, কেমন অভ্যর্থনা পাব, কিছুই ত ঠিক করিনি, জানাও নেই।

তাই?

বিষণ্ণ গলাতে বলল জগমগি। ওর উজ্জ্বল, সদা-হাস্যময় চোখদুটিতে এই প্রথমবার যেন বিষাদ দেখল পূর্ণ।

পূর্ণ কিছু বলার আগেই জগমগি বলল, আমার জন্যেই তোমার এত ভাবনা। আমি যদি হিন্দু হতাম, যদি তোমার মত বড়-খানদানের হতাম তবে ত তোমার এমন দুর্ভাবনা হত না।

আমার এখন খানদানই নেই। যে খানদান নিজ-হাতে আমাকে বে-খানদান করেছে তার আবার বড় ছোট কি? পয়সা থাকলেই কি মানুষের খানদান বড় হয়ে যায়? আমার বাবার তবু কিছু ছিল, পড়াশুনা, গান-বাজনা; কাকাদের কি আছে? তাঁদের নিয়ে আমার গর্ব করারও কিছু নেই, ঘৃণা করারও নয়। তাছাড়া, তোমার খানদানই বা ছোট কিসে?

পূর্ণ বলল।

তারপর বলল, দেখো জগমগি, তোমার দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছাতেই নিয়েছি। তুমি, হয়ত, তোমার মতন করে নিয়েছও স্বেচ্ছাতে আমার দায়িত্ব। নিজেদের সুন্দর ইচ্ছায় ভর করে যে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি একে অন্যের, তাকে যদি তুমি বা আমি মনে করি যে, সে দায়িত্ব চাপানো, বা আরোপিত, তবে আমাদের

নিজেদের গর্বই যে ধুলোয় লুটোবে। আমরা দেখিয়ে দেব পৃথিবীকে, আমরা দুজনে মিলে কি পারি, আর না পারি!

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে জগমগি বলল, তোমার পৃথিবী কত বড়? তাতে কে কে আছেন? কাদের দেখাবে তুমি?

বলেই, শব্দ না করে হাসল ও, পূর্ণর দু চোখে, পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে।

পূর্ণ বলল, জগমগি, আমার পৃথিবী আছে আমারই বুকের মধ্যে। নড়লে চড়লে, সেই পৃথিবী ; ঝুমঝুমির মতন বাজে। অন্যের কানে হয়ত সে আওয়াজ পৌঁছয়ই না।

মুগ্ধ বিস্ময়ে জগমগি আবার চাইল পূর্ণর দিকে।

পূর্ণও জগমগির দিকে মাঝে মাঝেই চেয়ে দেখছিল। কার্তিকের সকালবেলার আলো, রেললাইনের পাশের ডোবা, মাঠ, পাখি, গাছপালার বুক-পিঠ পিছলে এসে ঝলকে ঝলকে জগমগির রোদ-পড়া কমলা-রঙা শাড়িতে উদ্ভাসিত মুখখানিকে দেদীপ্যমান করে তুলছিল। আবার কখনও বা আলোর ছিদ্রিত ঝলকানি নয়, স্থির প্রতিভাস ; তার মুখটিকে সকালবেলার স্থলপদ্মর মতন বিভাসিত করে তুলছিল। বিভাস রাগের আলাপে যেমন করে সুর ফোটে।

জগমগি, মুখ ফেরাল জানালার দিকে। সিগন্যাল না পেয়ে, থেমেছে ট্রেনটা। সামনেই ছোট্ট কোন স্টেশান আছে। ঘন সবুজ রঙা জলের একটি ডোবা। রেল-লাইনের ধারে, তার মধ্যে মধ্যে হালকা-সবুজ শ্যাওলাকুচির আস্তরণ পড়েছে। একটা পোঁতা-বাঁশের খোঁটার উপরে গাঢ় লাল আর নীলে-মেশা মাছরাঙা বসে আছে দার্শনিকের মতন। ট্রেনটা থামাতে, কার্তিকের সকাল-সাড়ে দশটার নীলাকাশের শামিয়ানার নীচে, কাঁসা-রঙা রোদের কুচি ওড়ানো বাতাসটার শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধান-কেটে নেওয়া মাঠের উপরে। হঠাৎই মাছরাঙাটা কি যেন বলে, উড়ে গেল খোঁটা ছেড়ে। ঐটুকু চকিত শব্দেই ভরে উঠল বিশ্ব-চরাচর। রোদ ছিটকালো তার ডানাতে।

জগমগি ভাবছিল, তার মেয়ে হলে, নাম রাখবে কোনো "শ্রুতি"র নামে। তীব্রা বা কুমুদ্বতী। আর ছেলে হলে, নাম রাখবে "রাগে"র নামে ; হাম্বীর অথবা কামোদ।

পূর্ণও জানালা দিয়ে ঐ হঠাৎ-নিস্তব্ধতায় মোহিত হয়ে বাইরের রৌদ্রালোকিত উষ্ণ প্রকৃতির দিকে চেয়ে ছিল। ভাবছিল, আই.এ.সির পা-টেপাটা উপলক্ষ্য মাত্র। পায়ের শিকল-কেটে, এই নবীন পাখি হয়ে, মুক্ত-আকাশে উড়ে আসাটা সম্ভবই হতো না, যদি না জগমগি বাইরে থেকে তাড়া না লাগাত যে তাড়া, তার শরীর এবং মন দুইকেই এক দারুণ গতিজাড্য দিয়েছে।

দারিদ্র কাকে বলে, পূর্ণ তা জেনেছিল। কিন্তু চরম দারিদ্রর মধ্যেও দারিদ্র্যকে লজ্জা বলে মানেনি। বরং তা স্বীকার করার বিরল গর্বে, গর্বিত করেছে নিজেকে।

যে-মানুষের কোনো না কোনো কারণে ন্যায্য গর্ব নেই ; সে মানুষ মানুষই নয়। খুব কম বড়লোকই দেখেছে ও, যাঁদের বড়লোকি, তাঁদের মনুষ্যত্বকে মানুষখেকো বাঘেরই মতন চিবিয়ে খায়নি। তাই, বড়লোক হবার বিন্দুমাত্র বাসনাই নেই। পূর্ণ, সরস্বতীকে নিয়েই সুখী থাকবে বাকি জীবন।

জগমগি, বাইরে থেকে চোখ ফেরাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পূর্ণও। চোখাচোখি হল দুজনের।

জগমগি বলল, রাতটা আমরা কোথায় কাটাব? আমাদের প্রথম রাত?

পূর্ণ, হাসল। বলল, দেখি। ফুলশয্যার রাত ত সবাই দারুণ ভাবেই কাটায়। পকেটে ত এখন অনেকই টাকা। খরচ করে ফেলার জন্যে হাত নিসপিস করছে। ভাল হোটেলেই গিয়ে উঠব। ফুল আনাব অনেক। আগরবাতিও। আর আজ বিরিয়ানি খাব তোমার সঙ্গে। গুলহার কাবাব। সেই ছেলেবেলায় শেষবার খেয়েছি, হাজারীবাগে।

হাসল, জগমগি।

বলল, তোমাকে আমি রোজ বিরিয়ানি খাওয়াব। দারুণ বিরিয়ানি রাঁধতে জানি আমি। মা, নিজে হাতে শিখিয়েছিল যে।

আর গান হবে না আজ রাতে?

পূর্ণ বলল।

নিশ্চয়ই হবে। আজ আমরা দরবারী কানাড়া গাইব।

গলার এবং শরীরেরও গান? পূর্ণ বলল।

বলেই বলল, কি?

জগমগি, মুখ ঘুরিয়ে নিল লজ্জাতে।

ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। আউটার সিগন্যালটা লাল থেকে সবুজ হয়েছে।

সবুজ, ওদেরও হাতছানি দিচ্ছে।

লালকে, বাধাকে ; সবরকম মানা ও নিষেধকে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা।

জগমগি বলল, গাঢ় গলাতে, আমার শীত করছে।

পূর্ণ বলল, আমার কাছে সরে এসো। খুব কাছে।

সমাপ্ত